কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান

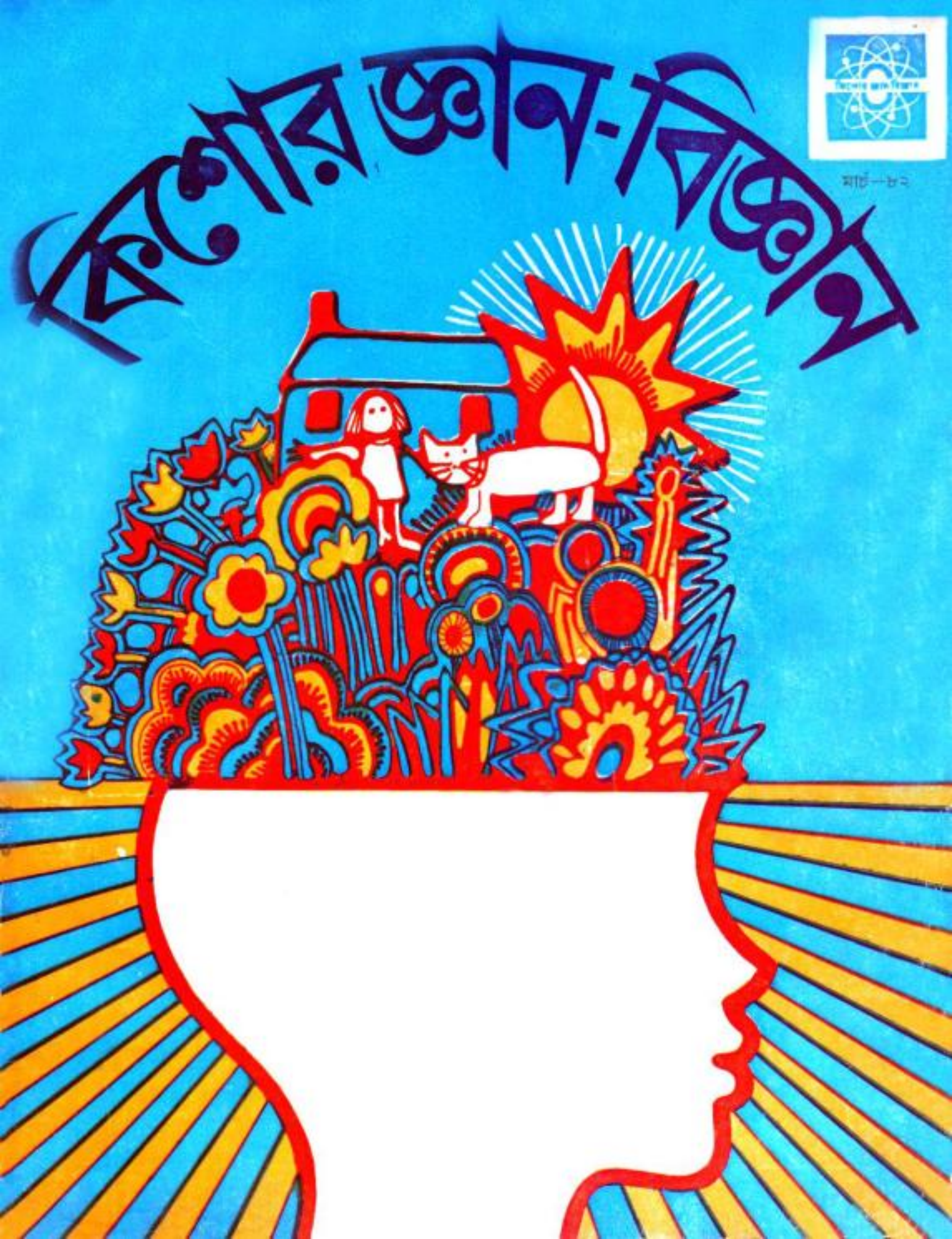

Hard Copy & Scan - Subhajit Kundu
Edit - Optimus Prime

This e-copy is scanned and preserved by
Dhulokhela Team Members

Anyone Can Contribute to our project by
giving their rare magazines for scan.

Reach us at
optifmcybertron@gmail.com

ক্যাপ্টেন ফ্যারাগুট, ওটা যে একটা দাঁতালো তিমি, এ বিষয়ে আপনার আর কোন সন্দেহ নিশ্চয় নেই?

না প্রফেসর, আমি এখন আপনার সঙ্গে একমত।

রাত গড়িয়ে চলল। জাহাজের গতিবেগ কমিয়ে দেওয়া হয়েছে অনেকখানি। জীবটা তির তির করে ভেসে চলেছে জলের উপর। ঘুম নেই কারো চোখে হঠাৎ শোনা গেল হুইসলের একটা তীক্ষ্ণ শব্দ --

হুই-হুই-হুই-হুই---

তিমির এ রকম গর্জন কখনো শুনিনি। ইশ-ওকে যদি হারপুনের আওতায় পেতাম!

জীবটার কাছে যেতে গেলে একটা নৌকা চাই। আর ওভাবে মারতে যাওয়া মানেই জাহাজের সকলকে বিপদের মুখে ঠেলে দেওয়া। আমি সে ঝুঁকি নিতে রাজী নই।

দিনের আলো ফুটে উঠতেই শুরু হল লড়াইয়ের প্রস্তুতি, কিন্তু জমাট কুয়াশা ঢেকে রেখেছে সমুদ্রের বুক ...

আটটার পর কুয়াশা কেটে গেল। ধীরে ধীরে পরিষ্কার হল দিগন্তরেখা ...

ঠিক তখুনি প্রাণীটার দেহ থেকে জল আর বাষ্প প্রায় ২০০ ফুট উপরে উঠে গেল।

ঐ- ওখানে, দেখুন সবাই!

হুম্, জীবটা তাহলে এইভাবে শ্বাসকার্য চালায়!

চিঠিপত্র

ফেব্রুয়ারী—১৯৮২'র কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞানে 'চিঠিপত্র' বিভাগে শ্রীযুক্ত বরুণদেব ব্যানার্জী মহাশয়ের 'রসায়নের সহজপাঠ' (কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান, ডিসেম্বর-১৯৮১) প্রবন্ধের লেখক অমরনাথ রায়ের নিকট উক্ত প্রবন্ধটি সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা প্রশ্নের উত্তর লেখকের হয়ে আমি, নিজেই দিচ্ছি। উনি জানতে চেয়েছেন 'লবণ কি বিক্রিয়াজাত পদার্থ নয়'? উত্তর হ'ল অবশ্যই লবণ একটি বিক্রিয়াজাত পদার্থ এবং $ZnSO_4$ যৌগটিই হইল বিক্রিয়াজাত একমাত্র লবণ। প্রশ্নকর্তা হয়ত প্রবন্ধটি মনযোগ সহকারে পড়লে বুঝতে পারবেন লেখক $ZnSO_4$ যৌগকেই লবণ বলতে চেয়েছেন। ভুলটা হয়েছে ছাপাখানায় কারণ লবণের আগে একটা 'কা' ভুলক্রমে ছাপা হওয়ায় বিক্রিয়াজাত পদার্থ হিসাবে $ZnSO_4$ এবং লবণকে আলাদাভাব প্রশ্নকর্তা মনে করেছেন। আশা করি লেখক অমরনাথ রায় মহাশয়ও একই উত্তর দেবেন।

গৌতম দাশগুপ্ত বংপুর পোঃ + জিলা—বর্ধমান, ৭১৩১০১।

লেখকের উত্তর

ফেব্রুয়ারী, ৮২ সংখ্যার 'কিশোর জ্ঞান বিজ্ঞান' পত্রিকায় নদীয়া জেলার মাটিয়ারী থেকে শ্রীমান বরুণদেব ব্যানার্জীর প্রশ্নোত্তর জানাই যে উক্ত লেখায় কোন ভুল নেই, কারণ জিংক সালফেট রসায়ন বিজ্ঞানে লবণের পর্যায়ভুক্ত যৌগ। তুমি হয়তো ভেবেছ যে জিংক সালফেট এবং হাইড্রোজেন ছাড়াও লবণ উৎপন্ন হয়। কিন্তু তা নয়। ওটা তোমার বোঝার ভুল। জিংক সালফেট নিজেই একটা লবণ।

অরমনাথ রায়।

ভ্রম সংশোধন

জানুয়ারী সংখ্যায় ১৮ পৃষ্ঠায় উৎপাদকটির উত্তর $(x-y-z)(x+y+z)$ এর পরিবর্তে $(x-y-z)(x+y+z+1)$ পড়তে হবে।

জানুয়ারী সংখ্যার 'বিজ্ঞান জিজ্ঞাসা'র সমাধানে 'রেডিয়ামের' পরিবর্তে রোডিয়াম পড়তে হবে।

॥ সূচীপত্র ॥

চিঠিপত্র ঃ ১ ॥ সম্পাদকীয় ঃ ২

দপ্তর থেকে

পাখি না দৈত্য ? ॥ সমরজিৎ কর ৩

উপন্যাস

শার্লক হোমস্ প্রফেসর চ্যালেঞ্জার ও মঙ্গলগ্রহ ঃ অদ্রীশ বর্ধন ২২

গল্প

হারানো কণ্ঠস্বর ॥ অরুণোদয় ভট্টাচার্য ৯

অভিযান

চির রহস্যময় কুমেরু ॥ রবীন বন্দ্যোপাধ্যায় ৫

পড়াশোনা

রসায়নের সহজপাঠ ॥ অমরনাথ রায় ১১

বৈদিক যুগের গণিত ॥ সিদ্ধার্থ রায় ২৫

ছায়ার মজা—মজার ছায়া ॥ অলক চক্রবর্তী ১৪

জীবন-বিজ্ঞানের প্রথম পাঠ ॥ তারকমোহন দাশ ৩৩

বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানী

প্রথম আর্যভট ॥ নন্দলাল মাইতি ১৭

বিজ্ঞান-বিচিত্রা ॥ অনীশ দেব ১৯

জ্ঞান-বিজ্ঞানের রচনা

অভিনব তাস খেলা ॥ দীপঙ্কর বসু ২৭

সূর্যের আলোয় রান্না ॥ কিন্নর রায় ৩২

মাটি থেকে আকাশে ॥ পার্থসারথি চক্রবর্তী ৪৬

খাদ্য ও পুষ্টি ॥ ডঃ মৃত্যুঞ্জয়প্রসাদ গুহ ৪২

ছবিতে গল্প

অজানা মহাকাশে ঃ দেবদাস ২৪

বিজ্ঞানসাধক জগদীশচন্দ্র ঃ দিলীপ দাস ৪১

হাবুলের বিজ্ঞানভাবনা ঃ ধীরেন বসু ৫৬

ছবির মজা ॥ স্থিতিজাড্য ঃ উজ্জ্বল ধর ২১

বিজ্ঞানের বিস্ময়

রহস্যময় শনির বলয় ॥ অমিতাভ সেন ৩০

পশুপাখীর গল্প

কাঠঠোকরা পাখিদের কথা ॥ অজয় হোম ৩৬

পুনর্মুদ্রণ

পিঁপড়েদের গোরু ॥ জগদানন্দ রায় ৪৮

ছোটদের দপ্তর

প্রশ্নোত্তর ৪৯ ॥ জুপিটারের বার্তা ॥ দেবাশিষ দাস ৫০

নিজে কর—স্পীকার ॥ সুবীরকুমার বিশ্বাস ৫২

বিজ্ঞান জিজ্ঞাসা ॥ শ্রীবৈজ্ঞানিক ৫২

ভারতীয় উদ্ভিদ উদ্যান ॥ সহদেব ভট্টাচার্য ৫৩

ভেবে ভেবে বল ॥ শুভব্রত রায়চৌধুরী ৫৪

বিজ্ঞান জিজ্ঞাসার সমাধান ৫৪

বুদ্ধি দিয়ে ব্যাখ্যা কর ॥ বিদ্যুৎ মজুমদার ৫৫

বিজ্ঞানের শব্দকূট ॥ পারমিতা রায় ৫৫

কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান

১ম বর্ষ ১০ম সংখ্যা মার্চ ॥ ১৯৮২
প্রধান সম্পাদক : সমরজিৎ কর
সম্পাদক : রবীন বল
সহ-সম্পাদক : জয়ন্ত দত্ত

সম্পাদকীয়

গোটা ফেব্রুয়ারি মাস জুড়েই কলকাতার বুকে চলছে বিজ্ঞান-মেলা ও প্রদর্শনী। ১লা থেকে ৪ঠা ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত যাদবপুর ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাসে বিজ্ঞানমেলা ও প্রদর্শনীর আয়োজন করেছিলেন, সায়ান্স এসোসিয়েশন অব বেঙ্গল। ৫ থেকে ৯ পর্যন্ত প্রদর্শনী হয়ে গেল জওহর শিশুভবনে। ২০মে থেকে ২৭শে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত বিড়লা ইনস্টিটিউট অব টেকনিক্যাল মিউজিয়ামেও চলবে বিজ্ঞানমেলা ও প্রদর্শনী। বিভিন্ন বিদ্যালয় ও বিজ্ঞান ক্লাবের মাধ্যমে যারা এই প্রদর্শনীতে অংশ গ্রহণ করেছিল তারা বেশীরভাগই তোমাদের মতো ছাত্র।

এই সব প্রদর্শনীর বিস্তৃত সংবাদ আগামী সংখ্যায় তোমাদের জন্য লেখা হবে—যে লেখা পড়ে হয়তো তোমাদের অনেকেই আগামী বছরের বিজ্ঞান প্রদর্শনীতে অংশ গ্রহণ করবে বলে আমি বিশ্বাস করি। কিন্তু সব কিছু করার মধ্যে মনে রাখতে হবে—বিজ্ঞান প্রদর্শনীর মূল উদ্দেশ্যই হল—সারা দেশের মানুষকেই বিজ্ঞানমুখী করে তোলা। সে ব্যাপারে তোমাদের ভূমিকা কিন্তু কম নয়।

দপ্তর থেকে

পাখি, না দৈত্য ?

সমরজিৎ কর

অতিকায় পাখি—টেরানোডন

তা পাখি না বলে উড়ন্ত দৈত্যও বলতে পারো। দৈত্যের মতই তো চেহারা। ওদের চোয়াল ছিলো ধনেশ পাখির মত। শিরদাঁড়া সরীসৃপের মত। বাজপাখির মত দুটি পা-ও ছিলো। সেই পায়ের নখ ছিলো ইস্পাতের মত শক্ত, আর ছিলো বিরাট দুটি ডানা। কতকটা বাদুড়ের মত। ডানার মাঝ বরাবর জোড়া ছিলো দুটি উপাঙ্গ। যেন খুদে খুদে দুটি হাত। সেই হাতের সাহায্যে গাছের ডালপালা অথবা কাণ্ড বেয়ে ওরা অনায়াসে চলাফেরা করতে পারতো গিরগিটির মত। যখন মাটির উপর বসে থাকতো, তখন মনে হতো যেন একটি আস্ত দৈত্য। ডানায় ভর করে আকাশে উঠলেই বলে যেত একটি রাক্ষুসে পাখি। ওদের দেহে ছিল আমাদেরই মত উষ্ণ রক্ত। উন্নত শ্রেণীর প্রাণীর মত ওদের মধ্যেও ছিলো একটি দলবদ্ধ সমাজ।

ওদের বলা হয় 'টেরোসর' বা 'টেরোডাকটাইলস' গোষ্ঠীর প্রাণী। আজ থেকে দশ কোটি বছর আগে পৃথিবীর সর্বত্রই ওরা বিচরণ করতো। বিজ্ঞানীদের ধারণা, আজ থেকে সাত কোটি বছর আগে পৃথিবীর ভূস্তরে যখন খড়িমাটি তৈরির কাজ প্রায় হতে শুরু করে, ঠিক ওই সময় বিচিত্র এই প্রাণী বিলুপ্ত হয়। খড়ি-পাথরের স্তরের মধ্যে থেকে যায় ওদের দেহাবশেষ শতাব্দীর পর শতাব্দী, শত শত শতাব্দী। ওরা পরিণত হলো জীবাশ্মে।

অবশেষে, হ্যাঁ, সেটা আঠারো খৃস্টাব্দের কথা। এক দল ভূতাত্ত্বিক খড়ি পাথরের স্তরের ভেতর আবিষ্কার করলেন ওদের জীবাশ্ম। তাঁরা থ। তো একি দেখছেন তাঁরা ? জীববিজ্ঞানীরা বিস্মিত হলেন আরও। ব্যাপারটা তাঁদের কাছে প্রহেলিকার মতই মনে হলো, তোমরাও জানো, আদিকাল থেকে পৃথিবীর বুকে সৃষ্টি হয়েছে কত রকম প্রাণী। সৃষ্টির পর তাদের দেহে এসেছে কত রকম পরিবর্তন। বিজ্ঞানীরা বলেন, এখন যাদের 'গিরগিটি' অথবা 'টিকটিকি' বলছে, কোটি কোটি বছর আগে তাদের পূর্বপুরুষদের চেহারা ছিলো দৈত্যের মত। মাথায় ছিলো কুড়ি তিরিশ ফুট অথবা তারও চেয়ে উঁচু। কোটি কোটি বছরে পৃথিবীর পরিবেশ পালটেছে। সেই সঙ্গে পালটেছে তারাও। পালটেছে তাদের দেহ, আচরণ। এই পরিবর্তনকেই বলা হয় জৈবিক বিবর্তন। বিবর্তনের তাল সামলাতে গিয়ে অনেকে অবলুপ্ত হয়েছে। অনেকে টিঁকে গেছে। পরিবর্তিত দেহে, 'আচরণে যেমন টিকটিকি'।

যা বলছিলাম, সেই রাক্ষুসে পাখি। ওদের আবিষ্কার করার পর বিজ্ঞানীমহলে কিন্তু শুরু হলো নানারকম জল্পনা। সেই জল্পনার এখনও শেষ হয় নি। কী ভাবে তারা সৃষ্ট হলো, কেন অবলুপ্ত হলো, সে সম্পর্কে এখনও কেউ নিশ্চিত নন।

তবে বিজ্ঞানীরা মোটামুটিভাবে যা বলতে চান, তা এইঃ ওই প্রাণী গোষ্ঠীর সবাই আয়তনে যে কেউকেটা ছিলো, তা নয়। কোন প্রজাতি ছিলো দৈত্যের মত। কোন প্রজাতির আয়তন ছিলো বাবুই পাখির মত। যাদের বলা হয় 'টেনোড্রাকন'।

দৈত্যের মত যারা চলাফেরা করতো, তাদের দুটি পাখা এক সঙ্গে মেললে লম্বায় দাঁড়াতো সাতাশ ফুটেরও বেশি। অর্থাৎ অ্যালবাট্রস পাখির দুটি পাখনার মিলিত দৈর্ঘ্যের প্রায় দ্বিগুণ। এখানে বলে রাখি, 'অ্যালবাট্রসই'

পৃথিবীর দীর্ঘতম পাখাওয়ালা পাখি। যখন এরা এদের দুটি পাখা পুরোপুরি মেলে ধরে তখন তাদের দৈর্ঘ্য দাঁড়ায় বারো ফুটের মত। যাই হোক, জীববিজ্ঞানীদের ধারণা, 'টেরোসরস' সমসাময়িক প্রাণীদের মধ্যে খুবই উন্নত ধরনের ছিলো। বিভিন্ন পরিবেশে নিজেদের বাঁচিয়ে রাখার জন্যে ওরা নানা রকম কৌশল অর্জন করে। সেই সঙ্গে পাখা দুলিয়ে ওড়ার কতকগুলি অদ্ভুত পদ্ধতিও।

যেমন ধারা, ওড়ার ব্যাপারটা। পক্ষীবিজ্ঞানীদের মতে পাখির ওড়া দুই ধরনের। এক, প্রত্যক্ষ ওড়া। এ ক্ষেত্রে নিজের শক্তিকে কাজে লাগিয়ে তারা ঝাপটা মেরে পাখা দুলিয়ে বাতাস কাটার চেষ্টা করে। দুই. গা ভাসিয়ে ওড়া। ইংরেজিতে যাকে বলা হয় 'গ্লাইডিং'। 'গ্লাইডিং'-এর সময় পাখিরা তাদের ডানা প্রসারিত করে বাতাসের বুকে গা ভাসিয়ে রেখে দেয়। তখন ডানা চালনার জন্যে তারা শক্তি ব্যবহার করে কম। অনেক পাখি ওড়ার সময় ডানা ঝাপটায় বেশি। যেমন চড়ুই, আবার আলবাট্রসের মত পাখিরা ডানা না ঝাপটে হাওয়ায় গা ভাসিয়ে মাইলের পর মাইল উড়ে যেতে পারে। বিজ্ঞানীদের ধারণা, প্রাচীন ওই পাখি হাওয়ায় গা ভাসিয়ে চলায় অনেক বেশি দক্ষ ছিলো।

প্রাচীন ওই পাখিদের মধ্যে সবচেয়ে বড় ডানা ছিলো 'টেরানোডন' নামে এক প্রজাতির পাখির। তাদের দুই পাখার মিলিত দৈর্ঘ্য ছিলো সাতাশ ফুটের মত। সেই পাখা তৈরি হয়েছিল বাদুড়ের চামড়ার মত পাতলা চামড়ার আস্তরণ দিয়ে। যা বিস্তৃত হয়ে থাকতো ডানার এক প্রান্ত থেকে দুটি পায়ের গোড়ালি, কাঁধ, এমন কি দুটি পায়ের পেছন দিকের ফাঁক পর্যন্ত। ফলে তাদের পাখা প্রসারিত করলে তার আয়তন গিয়ে দাঁড়াতো এক হাজার বর্গফুটেরও বেশি। তাই ওড়ার সময় বাতাসে ভেসে থাকাটা তাদের কাছে সহজতর হতো।

দেহের ওজন কম হলে বাতাসে ভাসা সহজ। বিবর্তনের দরুন সে সুবিধেও পেয়েছিল তারা। বিবর্তনের শেষ ধাপে তাদের দেহের হাড়গুলি হয়ে পড়েছিল যথেষ্ট হাল্কা এবং ফাঁপা। তাদের ডানার কিছু কিছু হাড় ব্লটিং কাগজের মত পাতলা হয়ে যায়। অমন পাতলা এবং হাল্কা হাড় পরবর্তীকালে আর কোন প্রাণীর দেহে দেখা যায় নি।

আরও একটি মজার ব্যাপার। বিজ্ঞানীদের মতে বিবর্তনের দরুন টেরানোডনদের হাড়গুলি যখন হাল্কা হতে শুরু করে, সেই সঙ্গে তারা তাদের দাঁতগুলিও হারাতে শুরু করে। যে দাঁত এক সময় ছিলো ভারী এবং মজবুত, ধীরে ধীরে সে দাঁত কেমন যেন পালটে গেল, তার বদলে গজিয়ে উঠলো পাখির মত চঞ্চু। ওজনে হাল্কা, কিন্তু বেজায় বড়। ওদের পূর্বপুরুষদের দেহে ছিলো পুচ্ছ। ক্রমে তা খাটো হতে হতে এক সময় অদৃশ্য হয়ে গেল। দুটি পা হয়ে পড়লো বেঁটে।

আঘাত অথবা কোন রকম বাইরের চাপে দেহটি যাতে না দুমড়ে তার জন্যে তাদের কাঠামোটিই হয়ে পড়েছিল বড় অদ্ভুত ধরনের। বুকের ফাঁপা ফাঁপা হাড়গুলি গিয়েছিল জুড়ে। বাকি অংশ একত্রিত হয়ে মূল দেহটিকে গড়ে তুলেছিল একটি বাতাসের মত।

দেহটিকে হাল্কা করে ফেলার দরুন বাতাসে ভর দিয়ে ওড়ার সময় 'টেরানেডন'র তাদের গতি অস্বাভাবিক ভাবে কমিয়ে আনতে পারতো। ঘণ্টায় পনের মাইলের মত। অত কম গতিতে অত বড় একটি দেহ নিয়ে উড়ে বেড়ান সত্যিই যেন বিস্ময়কর ব্যাপার।

ওদের প্রধান খাদ্য ছিলো মাছ। তাই খাদ্যের জন্যে কখনও কখনও তাদের নেমে আসতে হতো সমুদ্রের বুকে। কিন্তু এর জন্যে কোন অসুবিধে হতো না। সমুদ্রের বুকে ঢেউ। তার ধাক্কায় সেখানকার বাতাসের গতি বেশির ভাগ সময় ঘণ্টায় পনের মাইলের বেশিই থাকে, তাই সেখান থেকে মাছ ধরে অনায়াসেই তারা উড়ে যেতে পারতো ঊর্ধ্বাকাশে। তারপর বাতাসের গতির সঙ্গে তাল রেখে গা ভাসিয়ে এসে নামতো কোন পাহাড়ের চূড়ায়—নিজেদের আবাসে।

দেখা গেছে ওদের মস্তিষ্কের গঠনের সঙ্গে এখনকার পাখিদের মস্তিষ্কের গঠনের মধ্যে মিল রয়েছে। বিশেষ করে মস্তিষ্কের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ 'সেরিব্রাল হেমিস্ফিয়ার'-এর সঙ্গে তো বটেই, এ থেকে মনে হয় প্রাণী হিসেবে টেরানোডনরা যথেষ্ট চতুর ছিলো। বাঁচার তাগিদে ওদের উড়তে হতো ঘণ্টার পর ঘণ্টা। ওই সময় দেহ থেকে বেরিয়ে আসতো উত্তাপ। সেই উত্তাপ জমতো ওদের দেহের হাল্কা পশমের মধ্যে। সেই পশমেরও অস্তিত্ব আবিষ্কার করেছেন বিজ্ঞানীরা। ডানার আঙুলের মত উপাঙ্গকে হয়ত ওরা কোন কিছু আঁকড়ে ধরার কাজে লাগাতো। অথবা দেহটিকে আঁচড়ে পরিষ্কার করার কাজে।

ওই পাখি কেন অবলুপ্ত হলো তার সঠিক উত্তর এখনও পাওয়া যায় নি।

বিস্ময়কর অভিযান

চির রহস্যময় কুমেরু

রবীন বন্দ্যোপাধ্যায়

আমাদের এই পৃথিবীর সর্ব দক্ষিণ প্রান্তে আছে এক চির রহস্যময় তুষার রাজ্য, যার নাম 'আণ্টার্কটিকা' বা কুমেরু মহাদেশ। বিশ্বকবির ভাষায় তার বর্ণনা দিতে গেলে বলতে হয়—

'যেখানে লয়েছে ধরা অনন্ত কুমারী-ব্রত, হিমবস্ত্র পরা নিঃসঙ্গ, নিস্পৃহ, সর্ব আভরণহীন ; যেথা দীর্ঘ রাত্রি শেষে ফিরে আসে দিন শব্দ শূন্য সঙ্গীতবিহীন।'

ভূ-পৃষ্ঠের এক বিরাট অঞ্চলব্যাপী বিস্তৃত এই মেরু-মহাদেশ, আয়তনে যা ইউরোপ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সম্মিলিত এলাকার প্রায় সমান। অথচ এই বিরাট ভূখণ্ড সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান অতি সীমিত। বিজ্ঞানের বলে বলী হয়ে মানুষ কত অসাধ্য সাধন করেছে, সম্ভব করেছে কত অসম্ভবকে। দুরারোহ হিমালয়ের সর্বোচ্চ চূড়ায় আরোহণ করেছে, অসীম সমুদ্রের অতল গর্ভে সে নেমেছে, মহাশূন্যের বুক পাড়ি দিয়ে কত শত কোটি যোজন দূরে চন্দ্রপৃষ্ঠে তার পদচিহ্ন রেখেছে, পরমাণুর অপরিমেয় শক্তি উন্মোচন করেছে। অথচ ভূপৃষ্ঠেরই উপর অবস্থিত কুমেরু অঞ্চল সম্বন্ধে সকল তথ্য এখনও পর্যন্ত সে সংগ্রহ করতে পারে নি। কিন্তু কেন পারে নি? এ প্রশ্ন আমাদের মনে স্বভাবতই উঠতে পারে। এর একমাত্র উত্তর হচ্ছে প্রাকৃতিক দুর্গমতা। দক্ষিণ মেরুকে জগতের সকলের কাছ থেকে লুকিয়ে রাখবার জন্যে যেন প্রকৃতি দেবী তার চারদিকে দুর্লঙ্ঘ্য তুষার প্রাচীর গড়ে রেখেছেন।

কিন্তু যা দুরূহ, যা দুর্গম, যা দুর্জ্ঞেয় তা-ই চিরদিন দুঃসাহসিক মানুষকে হাতছানি দেয় এবং মানুষও জীবন-মরণ তুচ্ছ করে এগিয়ে যায় তার বিজয়কেতন ওড়াতে। দুরধিগম্য দক্ষিণ মেরুতে উপনীত হবার জন্যে বহু দেশের বহু দুঃসাহসিক পর্যটক অভিযান চালিয়েছেন।

কুমেরু বৃত্ত সর্বপ্রথম আবিষ্কার করেন জেমস্ কুক (১৭৭২-৭৫)। তার পর থেকে বিভিন্ন রাষ্ট্রের পর্যটকেরা কুমেরু অঞ্চলে অভিযান চালান। ১৯০১ সালে 'ডিস্কভারি' নামে একটি জাহাজ স্কট ও শ্যাকলটন তাঁদের সঙ্গীদের নিয়ে দক্ষিণ মেরুর দিকে যাত্রা করেন। বহুদূর পর্যন্ত অগ্রসর হয়েও কুমেরু অঞ্চলের তুষার-প্রাচীরের মধ্য দিয়ে মেরু প্রান্ত যাবার পথ না পেয়ে তাঁরা ফিরে আসতে বাধ্য হন। এরপর

কুমেরুর বিশিষ্ট বাসিন্দা পেঙ্গুইন

আরও দুবার স্কট তাঁর অভিযান চালালেন, কিন্তু পূর্ববর্তী ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটলো প্রতিবারই। অবশেষে ১৯১২ সালে ১৬ জানুয়ারি স্কট তাঁর কয়েকজন সঙ্গীকে নিয়ে তাঁদের জীবনের পরম ঈপ্সিত দেশ দক্ষিণ-মেরুতে এসে উপনীত হলেন। সাফল্যের আনন্দে স্কটের প্রাণমন উদ্বেলিত হয়ে উঠল। কিন্তু স্বদেশের গৌরব পতাকা দক্ষিণ মেরুর তুষারের বুকে প্রোথিত করতে গিয়ে এ কি দেখলেন স্কট। দেখলেন যেখানে তাঁর স্বদেশ ব্রিটেনের বিজয়কেতন উড্ডীন করবেন বলে ভেবেছিলেন, সেখানে সগৌরবে উড্ডীন রয়েছে নরওয়ে দেশের বিজয় পতাকা। তাঁদের আসবার মাত্র চার সপ্তাহ আগে ১৯১১ সালের ১৪ ডিসেম্বর নরওয়ের বিখ্যাত আবিষ্কারক আমুন্ সেন সেখানে এসে পদার্পণ করেন। দক্ষিণ মেরুর প্রথম আবিষ্কারক রূপে আমুন্সেনের নামই লিখিত হলো ইতিহাসের পাতায়। যে পরম গৌরবের আশায় পদে পদে মৃত্যুকে উপেক্ষা করে স্কট এতদিন সংগ্রাম করেছিলেন ভাগ্যের নিদারুণ পরিহাসে তিনি বঞ্চিত হলেন সেই গৌরব থেকে। ভগ্ন হৃদয়ে ফিরে আসতে হলো তাঁকে।

কিন্তু স্বদেশে ফিরে আসা আর হলো না। যে দক্ষিণ মেরু ছিল তাঁর জীবনের স্বর্গলোক, ফেরবার পথে প্রাকৃতিক দুর্বিপাকে তিনি ও তাঁর সঙ্গীরা সেই চির-তুহিনের দেশে তুষার-সমাধির মধ্যে চিরবিশ্রাম লাভ করলেন!

ক্যাপ্টেন স্কট দৈনন্দিন ডাইরি লিখতেন। মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি ডাইরি লিখেছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর অনুসন্ধানী দল দক্ষিণ মেরুতে গিয়ে সেই ডাইরি খুঁজে পান। ডাইরির শেষ পাতায় স্কট লিখেছিলেন: 'গত এক মাস যাবৎ আমরা যা কষ্ট পেয়েছি, আমি ভাবতে পারি না কোনো মানুষ কোনোদিন সেরকম কষ্ট সহ্য করেছে কিনা! তবুও আজ ভাগ্যের বিরুদ্ধে আমার কোনো নালিশ নেই। যা পেয়েছি তা মাথা পেতে গ্রহণ করছি। যদি আমরা বেঁচে থাকতে পারতুম, তাহলে ইংলণ্ড শুনতে পেত যে ইংলণ্ডের গৌরবের জন্যে তার কয়েকজন সন্তান কী কষ্টই না সহ্য করেছে! আমাদের এই মৃতদেহ আর আমরা এই লেখা হয়তো জগতে একদিন সে-কাহিনীর সাক্ষ্য দেবে।' দক্ষিণ মেরুর কথা বলতে গেলে আজও তাই স্কটের করুণ মৃত্যুবরণের কাহিনী স্মরণ না করে পারা যায় না।

দক্ষিণ মেরু আবিষ্কারের পর থেকে বিজ্ঞানের ক্রমোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে কুমেরু অঞ্চলে গমনাগমনের দুর্গমতা ক্রমশ হ্রাস পেয়েছে। বিশেষ করে উন্নত ধরনের বিমানযান ও বরফ ভাঙার আধুনিক যন্ত্রপাতি আজকাল কুমেরু অভিযানকে আগের তুলনায় অনেকখানি সুগম ও সহজ সাধ্য করে তুলেছে। এর ফলে কুমেরু মহাদেশের অনেক অজানা তথ্য সংগৃহীত হয়েছে এবং তা সম্ভব হয়েছে প্রধানত উইলকিনস্, বার্ড, লিপ্‌লে মওসন, কুজেন, ডুফেক প্রমুখ অভিযাত্রীদের চেষ্টায়।

আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী পৃথিবীর সকল রাষ্ট্রেরই কুমেরু মহাদেশে অভিযান ও গবেষণা চালাবার অধিকার আছে। কুমেরুতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আছে চারটি গবেষণা কেন্দ্র, সোভিয়েত রাশিয়ার ছটি, অস্ট্রেলিয়ার দুটি, এবং গ্রেটব্রিটেন, নিউজিল্যাণ্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা, চিলি, ফ্রান্স ও জাপানের প্রত্যেকের আছে একটি করে গবেষণাকেন্দ্র। ১৯৫৭-৫৮ সালে আন্তর্জাতিক ভূ-পদার্থ বৈজ্ঞানিক বর্ষে বিভিন্ন রাষ্ট্রের বিজ্ঞানীরা সুনির্দিষ্ট কর্মসূচীতে কুমেরু মহাদেশের বিভিন্ন অংশে ১৮ মাস ব্যাপী গবেষণা ও পর্যবেক্ষণ চালিয়েছিলেন। তাঁরা পরস্পর সংগৃহীত তথ্যাদি বিনিময় করেন এবং একে অপরের গবেষণাকেন্দ্রে যাবার সুযোগ পেয়েছিলেন।

ভূ-পৃষ্ঠে অবস্থিত হলেও কুমেরু পৃথিবীর অবশিষ্টাংশ থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। মানুষ বসবাসকারী পৃথিবীর অংশ ও চন্দ্রের মধ্যবর্তী এক অন্য গ্রহ যেন কুমেরু। সেখানে কোনো মানুষই স্থায়ীভাবে বসবাস করে না এবং বছরের ৬-৭ মাস পৃথিবীর অবশিষ্ট অংশ থেকে সেখানে যাওয়াও সম্ভব নয়। কেবলমাত্র অভিযাত্রী ও গবেষকদল সেখানে যান কয়েক দিন, কয়েক সপ্তাহ, কয়েক মাস অথবা দু-এক বছরের জন্যে বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে। আজ পর্যন্ত কোনো মানব সন্তান কুমেরুর বুকে ভূমিষ্ঠ হয়নি।

কুমেরু-অঞ্চল পর্বতময়। অধিকাংশ স্থানই বরফ ও তুষারে সমাচ্ছন্ন। প্রতিটি উপত্যকা দিয়ে নেমে এসেছে ছোট বড় বহু হিম-নদী এবং শেষে গিয়ে মিশেছে সমুদ্রে। এই সমুদ্র আবার বছরের ৬ থেকে ৯ মাস পর্যন্ত জমাট হয়ে থাকে বরফে। এই বরফ যখন গলতে থাকে, তখন বরফ স্তূপের মাঝে মাঝে ফাটল দেখা দেয়। এই সময় এক মহাবিপদ হয় এই যে, কোনোক্রমে জাহাজ যদি পর্বত সমান এই বরফ চাঁইয়ের সম্মুখে এসে পড়ে তাহলে জাহাজ নিমিষে কোথায় তলিয়ে যাবে।

পৃথিবীর শীর্ষে সুমেরু অঞ্চল থেকে সর্বনিম্ন কুমেরু অঞ্চলের পার্থক্য অনেকখানি। উত্তর মেরুর অন্তর্গত সুমেরু অঞ্চলের জল বা জমাট-বাঁধা সাগর চারদিকে স্থলভাগ দিয়ে ঘেরা। অপরপক্ষে কুমেরু অঞ্চলের স্থলভাগ চারদিকে সমুদ্র দিয়ে ঘেরা। কুমেরুর শতকরা ৯৫ ভাগ বরফ ও তুষারে সমাচ্ছন্ন। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে এই বরফ কুমেরুতে সঞ্চিত হয়েছে। তুষারাচ্ছন্ন কুমেরুর বুকে কোনো গাছপালা বা উদ্ভিদ দেখা যায় না, তার আবহাওয়ায় আর্দ্রতা নেই বললেই চলে। তাই কুমেরু হচ্ছে মরুভূমির মতো শুষ্ক নিষ্প্রাণ অঞ্চল।

১৯৭৬-৪৭ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অ্যাডমিরাল বার্ড কুমেরু অঞ্চলে দ্বিতীয়বার অভিযান পরিচালনা করেন। বার্ডই একমাত্র ব্যক্তি, যিনি উত্তর ও দক্ষিণ উভয় মেরু অঞ্চলে অভিযান চালিয়েছিলেন। আজকে কুমেরু অঞ্চল সম্পর্কে যত তথ্য জানা গেছে তার অধিকাংশই বার্ডের অভিযানের ফলে সংগৃহীত। ১৯৭৬-৪৭ সালের অভিযানে কুমেরু অঞ্চল সম্পর্কে বহু বিচিত্র তথ্য সংগৃহীত হয়। তার মধ্যে সবচেয়ে বিস্ময়কর আবিষ্কার হলো মেরু প্রান্তরের স্থান বিশেষে 'মরুদ্যান'-এর সমান লাভ। বালুকাময় মরুভূমির স্থানবিশেষে যেমন গাছপালা জলাশয়পূর্ণ মরুদ্যান দেখা যায়, কুমেরু অঞ্চলের 'তুষার-মরুভূমি'র স্থানবিশেষে তেমনি তুষারবিহীন নীল ও সবুজ রঙের হ্রদ দেখতে পান

তারা। জলের রঙ সকল হ্রদে একরকম নয়। আকাশ নীল থেকে গাঢ় সবুজ রঙের জল দেখা যায় হ্রদ বিশেষে। কোথাও বা জলের রঙ লালচে। এই বর্ণ বৈষম্যের কারণ হলো হ্রদের জলে সেই রঙের উদ্ভিদ থাকার দরুনই জলের রঙ এরকম হয়। হ্রদের জলে সবুজ, নীলাভ সবুজ, লাল ও গেরুয়া রঙের অসংখ্য শেওলা ও এককোষী উদ্ভিদ জন্মায়। বার্ড পরিচালিত অভিযাত্রী দলের আর একটি

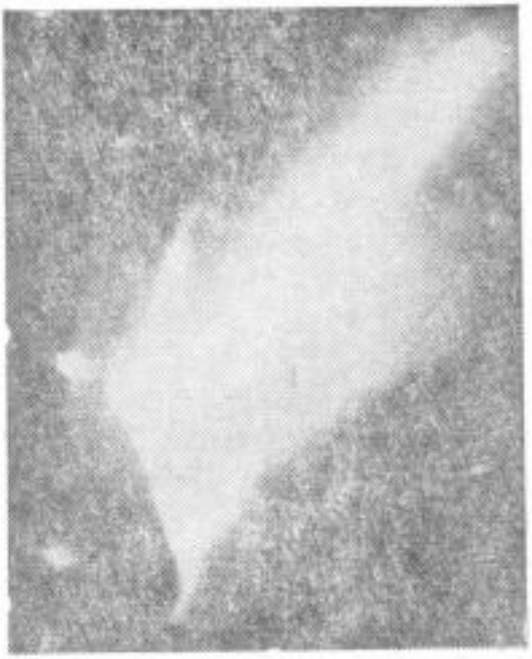

দক্ষিণ মেরুজ্যোতি অরোরা অস্ট্রেলিস

উল্লেখযোগ্য আবিষ্কার হলো ৩২ হাজার বর্গ কিলোমিটার দীর্ঘ একটি উপসাগরের সন্ধান লাভ। কুমেরু মহাদেশের অভ্যন্তরে ৩২০ কিলোমিটারেরও অধিক এই উপসাগর বিস্তৃত। এই উপসাগর ছাড়া নতুন দ্বীপপুঞ্জ, দ্বীপ, উপদ্বীপ এবং সাগরও তাঁরা আবিষ্কার ও জরিপ করেন। নৈসর্গিক শোভার এক বিচিত্র রঙ্গভূমি কুমেরু অঞ্চল। সেখানে গ্রীষ্মকালে দীর্ঘ ৬ মাস একটানা দিন আবার শীতকালে দীর্ঘ একটানা রাত্রি। আকাশে আলোছায়ার বিচিত্র লীলা চলে সেখানে। 'অরোরা অস্ট্রেলিস' (Aurora Australis) নামে অভিহিত অপরূপ মেরুপ্রভার আলোকে উদ্ভাসিত হয় গগনমণ্ডল। এর বর্ণালীতে লাল ও সবুজ রঙের আভা বেশি এবং সৌর কলঙ্কের আধিক্য যখন ঘটে তখনই বৃদ্ধি পায় এই আলোকচ্ছটার ঔজ্জ্বল্য। শীতকালের দীর্ঘরাত্রিতে এই মেরুপ্রভা দেখা যায়।

কুমেরু মহাদেশকে বলা চলে প্রকৃতি দেবীর হাতে গড়া এক বিরাট 'রেফ্রিজারেটর বিশেষ'। হাজার হাজার বছর ধরে এখানকার আবহাওয়া শৈত্যপ্রভাবে সম্পূর্ণ জীবাণু মুক্ত। এখানে এলে মানুষের সর্দি-কাশি, ইনফ্লুয়েঞ্জা, নিউমোনিয়া রোগের কোনো বালাই থাকে না। শ্বাস-প্রশ্বাস-জনিত রোগাক্রান্ত ব্যক্তির ব্যাধি অচিরে দূর হয়ে যাবে এখানে।

যুগ যুগ কাল অতীত হয়ে গেলেও কোনো কিছুই এখানে জীর্ণ হবে না, শুধু এক প্রাণীদের দেহ ছাড়া। এর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য প্রমাণ হলো ১৯১২ সালে ক্যাপ্টেন স্কট ও তাঁর সঙ্গীরা দক্ষিণ মেরু থেকে ফেরবার সময় যে মর্মান্তিক মৃত্যুবরণ করেন, তার বহু বছর পরে অন্য অভিযাত্রীরা সেখানে গিয়ে তাঁদের মৃতদেহ, জিনিসপত্র সব কিছু অক্ষত অবস্থায় দেখতে পান। বিস্কুটের টিন কয়েকটা পাওয়া যায়। সে বিস্কুট তখনও খাবার উপযোগী ছিল, যদিও স্বাদ প্রায় নষ্ট হয়ে গেছে। একটা দেশলাই-এর বাক্স পাওয়া গেল, সেটা সহজেই জ্বলে উঠল। আর স্কটের ডাইরি দেখে মনে হয়েছিল, সেটা বুঝি কয়েক দিন আগে লেখা হয়েছে।

কুমেরু মহাদেশের খনিজ সম্পদও যথেষ্ট। স্কট ও বার্ডের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এই মহাদেশে পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি কয়লা স্তর আছে। প্রাগৈতিহাসিক যুগে যখন এশিয়া, আফ্রিকা প্রভৃতি মহাদেশ একত্র ছিল তখন কুমেরু অঞ্চলের আবহাওয়া ছিল নাতিশীতোষ্ণ। প্রমাণ স্বরূপ ফার্ন ইত্যাদি উদ্ভিদের জীবাশ্ম এখানে পাওয়া গেছে। অন্যান্য মহাদেশের মতোই বরফের নিচে কুমেরু মাটিও পাথর দিয়ে তৈরী। এখানে খনিজ পদার্থের অস্তিত্বের ধারণা যদি করা হয় তাতে কোনো অসঙ্গতির কারণ দেখা যায় না। কুমেরুতে লোহা, তামা, মলিবডিনাম, সোনা, রূপা ও ইউরেনিয়াম ইত্যাদি ধাতুর অস্তিত্বের সম্ভাবনা আছে বলে বিজ্ঞানীরা মনে করেন।

কুমেরু অঞ্চলে বসবাসকারী প্রাণীদের মধ্যে তিমি হলো প্রধান। আর দুই বিশিষ্ট বাসিন্দা হচ্ছে সীল ও পেঙ্গুইন। এরা অবশ্য বছরের সব সময় এখানে থাকে না, গ্রীষ্মকালেই সাধারণত অবস্থান করে। এ ছাড়া আছে এক বিশেষ শ্রেণীর কুকুর, যারা অভিযাত্রীদের স্লেজ গাড়ী টেনে নিয়ে যায়।

শুধু প্রাকৃতিক শোভা বৈচিত্র্যে নয়, বৈজ্ঞানিক গবেষণার দিক থেকেও কুমেরু অঞ্চল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। সমগ্র দক্ষিণ গোলার্ধের আবহাওয়াই নয়, বলতে কি পৃথিবীর আবহাওয়াও

কতকাংশে নিয়ন্ত্রণ করে কুমেরু অঞ্চল। কুমেরুর বরফ যদি বেশি পরিমাণে গলতে থাকে তা হলে পৃথিবীতে মহাপ্লাবন দেখা দেবে।

এ ছাড়া বিজ্ঞানের আরও কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ রহস্য মহাজাগতিক রশ্মি, মেরু-জ্যোতি, সৌরকলঙ্ক ও চুম্বকের আকর্ষণ-বিকর্ষণের রহস্য উদ্‌ঘাটিত হতে পারে কুমেরু অঞ্চলে যথাযথ গবেষণার দ্বারা। কুমেরু অঞ্চলের প্রতি বিশ্বের

কুমেরুর বুকে অভিযাত্রী দল

বিজ্ঞানীদের দৃষ্টি আজ তাই বিশেষভাবে নিবদ্ধ। সম্প্রতি (গত ৯ জানুয়ারি) অধ্যাপক এস. জেড কাসিমের নেতৃত্বে একটি ভারতীয় অভিযাত্রী দল কুমেরু মহাদেশের উত্তর ভাগের একটি ভূখণ্ডে অবতরণ করেছিলেন এবং প্রায় দু সপ্তাহ কাল সেখানে গবেষণা করে ফিরে এসেছেন। উপকূল থেকে প্রায় ৯০ কিলোমিটার দূরে তাঁরা একটি ছোটখাটো বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান কেন্দ্র স্থাপন করেন। বৈজ্ঞানিক গবেষণাকেন্দ্রটির নাম দিয়েছেন 'দক্ষিণ গঙ্গোত্রী'। তাঁরা যখন কুমেরুতে অবতরণ করেন তখন সেখানে গ্রীষ্মকাল এবং তাপমাত্রা ছিল শূন্যাঙ্কের নিচে ১০ থেকে ২০ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেডের মধ্যে। দক্ষিণ গঙ্গোত্রীতে অভিযাত্রী দল স্থাপন করেছেন একটি সৌর ব্যাটারীযুক্ত প্যানেল এবং একটি স্বয়ংক্রিয় আবহাওয়া সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রাহক যন্ত্র।

বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদ্যায় সমৃদ্ধ অন্যান্য দেশের তুলনায় ভারতীয় বিজ্ঞানীদের এই প্রচেষ্টা ক্ষুদ্র ও স্বল্পকালীন হলেও তার বৈজ্ঞানিক তাৎপর্য রয়েছে। কুমেরু মহাদেশের বরফের আচ্ছাদনের সঙ্গে আমাদের হিমালয়ের উত্তুঙ্গ পার্বত্য-এলাকার বরফ-স্তূপের সাদৃশ্য আছে। কুমেরু থেকে সংগৃহীত তথ্যের সঙ্গে তুলনামূলক বিচার থেকেও কিছু নতুন তথ্য পাওয়া যাবে বলে ভারতীয় বিজ্ঞানীদের বিশ্বাস। এছাড়া ভারত মহাসাগর এবং মৌসুমী বায়ু সংক্রান্তও কিছু তথ্য এই অভিযানে সংগৃহীত হয়েছে। কুমেরু অভিযান শেষে ঘরে ফেরার পথে বিজ্ঞানী-অভিযাত্রী দল বিক্ষুব্ধ ভারত মহাসাগরের বুকে জেগে ওঠা এক পর্বত আবিষ্কার করেছেন। ভারতীয় দলের এই চমকপ্রদ আবিষ্কার আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভারতের মর্যাদা আরও বাড়িয়ে দিয়েছে।

---

২২ টেগোর ক্যাসল স্ট্রীট, কলি-৫

প্রকৃতি বিজ্ঞানী

গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্যের নতুন বই

পশু-পাখী কীট-পতঙ্গ ৮·০০

প্রকাশিত হয়েছে

শৈব্যা পুস্তকালয় ● ৮/১সি, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০৭৩

বিজ্ঞান ভিত্তিক গল্প

অরুণোদয় ভট্টাচার্য

অধ্যাপক দস্তিদার চিঠিটা পেয়ে রীতিমত হতবাক্। বিশ্বের অনেক দেশেই যে এ বিষয়ে গবেষণা চলছে সে কথা দস্তিদার জানেন। কিন্তু এই বিষয়ের ওপর যে এতগুলো বৈজ্ঞানিক একসঙ্গে বসেছেন, এবং প্যারিসের মত শহরে, দস্তিদার, এতটা আশা করেন নি। প্রফেসর ম্যাকাচিও নিমন্ত্রণ পত্র পাঠিয়েছেন। ম্যাকাচিওর সঙ্গে দস্তিদারের চাক্ষুষ পরিচয় নেই ঠিকই, কিন্তু তিনিও যে দস্তিদারের মত একই বিষয়ে গবেষণা করেছেন তা তিনি জানেন! ম্যাকাচিও যাবার টিকিটও পাঠিয়ে দিয়েছেন। হাতে মাত্র আর চারটি দিন। এর মধ্যে সব গুছিয়ে নিতে হবে।

অধ্যাপক দস্তিদার আজ প্রায় আট বছর ধরে এ বিষয় নিয়ে গবেষণা করছেন। কি নাম দেওয়া যায় বিষয়টার। বাংলা করলে দাঁড়ায় হারানো কণ্ঠস্বর। হ্যাঁ যে কথা আজ উচ্চারিত হল, সে কথা একেবারেই হারিয়ে গেল, সেই কণ্ঠস্বর কি মুছে গেল চিরদিনের মত। এ প্রশ্ন করলে দস্তিদার বলবেন—কখনই না। বিজ্ঞান তা বলে না। শব্দ শক্তি। শক্তির ধ্বংস নেই। সে রূপান্তরিত হতে পারে। অন্য শক্তির রূপ নিতে পারে। কিন্তু পৃথিবী থেকে মুছে যেতে পারে না, উড়ে যেতে পারে না। *অধ্যাপক দস্তিদারের গবেষণা এইটাই। সেই হারানো* কণ্ঠস্বরকে আবার ফিরিয়ে আনা। অধ্যাপক দস্তিদারের এতদিনের গবেষণালব্ধ ফল হল একটি যন্ত্র। নাম দিয়েছেন পাস্ট্ রেকর্ডার। সঠিক জন্ম তারিখ দিলে অধ্যাপক দস্তিদার বিশেষ কোন ব্যক্তির কণ্ঠস্বর শোনাতে পারেন। যদিও এখন সে কণ্ঠস্বর খুব পরিষ্কার নয়। কিন্তু দস্তিদার এমন দু'একটি ভাষণ শুনেছেন যা দিয়ে স্পষ্ট বোঝা যায় এ ভাষণ মহাত্মা গান্ধীর। দস্তিদারের যৌবনের দিনগুলিতে একাধিকবার এমন ভাষণ শুনেছেন। দস্তিদার তার খুবই নিকট কয়েকজন বন্ধুকে বলেছেন, তিনি এই যন্ত্রটিরই একটু উন্নতমানের করার চেষ্টা করছেন। সেটা সার্থক হলে ভারতবর্ষ এই বিষয়ে প্রথম আবিষ্কারের গৌরব অর্জন করতে পারবে। গতবছর সায়েনস্ ওয়াল্ড-এর বার্ষিক সংখ্যায় দস্তিদার এ বিষয়ে একটি প্রবন্ধ লিখে অনেকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন।

দস্তিদার মানুষটা একেবারেই সোজা সরল। গোটা দিনই প্রায় বাড়িতে থাকেন। তাকে চেনাটাও খুব সহজ। মাথায় প্রচুর চুল। কাজের সময় তাঁর স্বভাব মাথার মাঝখান থেকে পট পট করে চুল টেনে তোলা। এর ফলে মাথার মাঝখানটা অদ্ভুত দেখতে। ঠিক যেন দ্বীপের মত। পোশাকটাও একটু অদ্ভুত। কি শীত কি গ্রীষ্ম একটা

ছাই রঙের কোট পরে থাকেন। পাইপটা মুখেই থাকে। দৈবাৎ তাতে অগ্নিসংযোগ করেন। সন্ধের পরে পরে মাঝে মাঝে গলা ছেড়ে গান ধরেন। সে গান যদিও অন্যের কাছে সুখশ্রাব্য নয়। কিন্তু দস্তিদারের কাছে এ গান তার প্রাণ।

দস্তিদার বাড়ি ফিরেই সোজা তাঁর অফিস ঘরে চলে গেলেন। পেপার রেডি করতে হবে। আলোচনাচক্র যখন তখন পেপারতো একটা পড়তেই হবে। আজ রাতেই পেপারটা রেডি করে ফেলতে হবে। হাতে আর চারটি দিন।

প্যারিস বিমান বন্দরে নামতেই, তিনি না চিনলেও, ম্যাকাচিও ঠিকই চিনলেন তাঁকে। বললেন, সায়েনস্ ওয়াল্ডে আপনার ছবি দেখেছি। ম্যাকাচিওর গাড়িতেই দুজনে চললেন। ম্যাকাচিও বললেন, এ কদিন আমার অতিথি আপনি। প্রাণ খুলে আলোচনা করা যাবে। দস্তিদারের ভালোই লাগছিল। লোকটি বেশ মিশুকে। মিষ্টি স্বভাবের। এত বড় মানুষ কোথাও সে অহংকারের প্রকাশ নেই।

ম্যাকাচিওর বাড়িটাও বড় সুন্দর। চারপাশটা বেশ নির্জন। স্টাডিরুমটা দেখার মত। যদিও ম্যাকাচিও এখানে গবেষণার কাজ করেন না। লোকটি কথা বলেনও সুন্দর। ম্যাকাচিও বললেন, এই কোণের ঘরটা আপনার। এখানে ফোন আছে। আপনি এখানে উঠেছেন, অনেকেই জানেন তাঁরা ফোন করতেও পারেন। সব ব্যবস্থাই পাকা। দস্তিদার ম্যাকাচিওর আতিথেয়তায় মুগ্ধ হয়ে গেছেন।

ম্যাকাচিও তখনকার মত বিদায় নিলেন। বিকেলের দিকে আসবেন। দস্তিতার শুয়ে পড়লেন। একটু রিলাকস্ এর দরকার। শরীরটা বেশ ক্লান্ত লাগছে। এখন দুপুর দুটো। দস্তিদার পেশাকটা চেঞ্জ করে নিয়ে শুয়ে পড়লেন। ম্যাকাচিওর রুচিবোধকে প্রশংসা করতে হয়। সুন্দর সাজিয়েছেন ঘরটাকে। রাতে ম্যাকাচিও বলেছেন আলোচনা করবেন। আলোচনা কতক্ষণ চলবে কে জানে। দস্তিদার একটু ঘুমিয়ে নেওয়াই সঙ্গত মনে করলেন।

ঘুম ভাঙলো দরজায় নক করার শব্দে। একটু লজ্জিত হলেন মনে মনে। দরজা খুলে দিলেন দস্তিদার। ম্যাকাচিও বললেন, আপনার ঘুম ভাঙানোর জন্যে লজ্জিত। দস্তিদার বললেন, নতুন জায়গায় এতটা গভীর ঘুম হবে বুঝতে পারিনি। গরম কফি দিয়ে গেল একটি লোক। এ লোকটি কে দস্তিদার জানেন না। হয়তো বাড়িতে কাজ করে। সকাল থেকে তিনবার লোকটিকে দেখছেন অধ্যাপক দস্তিদার।

ম্যাকাচিও গরম কফিতে চুমুক দিয়ে বললেন—"আমি এ গবেষণার ব্যাপারে একেবারেই শিশু। আপনার কাজ বিশ্বের গর্ব।" এইভাবেই আলোচনা শুরু হল। দস্তিদার মনে মনে খুশিই হয়েছেন ম্যাকাচিওর কথায়। তিনি বললেন, আপনাকে আমার লেটেস্ট কাজ আজ দেখাবো। আজ পর্যন্ত কাউকেই দেখাইনি। ম্যাকাচিও কথাটার তেমন মূল্য দিলেন না। বেশ কিছুটা উদাসীন মনে হল।

দস্তিদার সুটকেশটা খুলে যন্ত্রটা বার করলেন। ছোট-খাট যন্ত্র। অনেকটা টেপ রেকর্ডারের মত। শুধু এর আটটা চাকা। যন্ত্রটার সামনে অসংখ্য নব। দস্তিদার বললেন, 'বলুন প্রফেসর ম্যাকাচিও. আপনার ডেটঅব বারথ্ বলুন।'

ম্যাকাচিও, একটু ভেবে বললেন –ফিফটিনথ্ জুলাই নাইনটিন থারটি টু।

—'থারটি টু।' দস্তিদার নব ঘোরাতে শুরু করলেন। যন্ত্র চলতে শুরু করলো। ম্যাকাচিও অবাক। একটু অস্পষ্ট হলেও, এ যে তার কণ্ঠস্বর পরিষ্কার বোঝা যায়। ম্যাকাচিও উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন। আনন্দে জড়িয়ে ধরলেন দস্তিদারকে।

তখনও কে জানতো, এর পরেই কোন ঘটনা অপেক্ষা করছে দস্তিদারের জন্যে। আনন্দে জড়িয়ে ধরার ভান করেই ম্যাকাচিও দস্তিদারকে সুইয়ে দিলেন ডিভানের ওপর। প্রথমটা দস্তিদার কিছুই বুঝতে পারেন নি। বুঝতে পারলেন যখন ম্যাকাচিওর হাতে ধরা রিভলবার দেখলেন। ম্যাকাচিও বললেন ওটা আমায় দিয়ে দাও, আর ওটা চালানো শিখিয়ে দাও।

দস্তিদার বুঝতে পারলেন, ম্যাকাচিও কিছুতেই এখনই তাকে শেষ করবে না। এখন কিছু সময় নেওয়াই বুদ্ধি-মানের কাজ।

হঠাৎ দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ। ম্যাকাচিও একটু ক্রুদ্ধ হয়েই দরজা খুলে দিল। প্রবেশ করলেন দুজন লোক। একজন বেশ লম্বা। লম্বা লোকটিই বললেন, আপনিই মিঃ দস্তিদার? দস্তিদার মাথা নাড়লেন। পেছনে প্রবেশ করলেন দুজন পুলিশ অফিসার। তারা ম্যাকাচিওকে ধরলেন।

লম্বা লোকটা বললেন, ক্ষমা করবেন আমার দেরি হওয়ায়, আমি বিমান বন্দরে আসতে পারিনি। এর ফলেই এই দুর্যোগ। ওর নাম ম্যাকাচিও নয়। ও নকল ম্যাকাচিও। ও একজন লোকের বারথ ডে জানে। তার নাকি অনেক গুপ্তধন ছিল। কোথায় আছে এ খবর অজ্ঞাত। ও ভেবেছিল আপনার যন্ত্রের সাহায্যে সেই গুপ্তধনের সন্ধান পাবে। ও নিজেও বিজ্ঞানের একজন গবেষক। কিন্তু ভ্রষ্ট।

ভাটপাড়া, নৈহাটী, ২৪ পরগনা

রসায়নের সহজ পাঠ

অমরনাথ রায়

জারণ সংখ্যার সাহায্যে জারণ-বিজারণ বিক্রিয়ার রাসায়নিক সমীকরণ ব্যালান্স করার নিয়ম :

জারণ সংখ্যার সাহায্যে জারণ-বিজারণ ক্রিয়ার সুসমঞ্জস সমীকরণ লিখতে হ'লে কয়েকটি নিয়ম মনে রাখা দরকার। সেই নিয়মগুলি এই রকম :

(i) প্রথমে বিকারক ও বিক্রিয়ালব্ধ পদার্থগুলির নির্ভুল সংকেতগুলির মধ্যে → চিহ্ন বসিয়ে একটি অসম্পূর্ণ সমীকরণ লিখতে হয়।

(ii) জারক ও বিজারক পদার্থের সংগঠক যে মৌল-গুলি বিজারিত এবং জারিত হয়, তাদের জারণ-সংখ্যা মৌল সংকেতের মাথায় লিখে রাখতে হয়।

(iii) জারক ও বিজারকের জারণ-সংখ্যার হ্রাস-বৃদ্ধি সমান করতে জারক ও বিজারককে উপযুক্ত সংখ্যা দিয়ে গুণ করতে হয়।

(iv) সমীকরণের সমতা আনার জন্যে অনেক সময় বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণকারী অন্য পদার্থকেও উপযুক্ত সংখ্যা দিয়ে গুণ করতে হয়।

(v) কোন কোন ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট সংখ্যক H_2O বা অ্যাসিড (H^+ আয়ন) অণু যোগ করেও সমীকরণের সমতা আনার দরকার হয়।

উদাহরণ : (ক) $\overset{0}{C}+\overset{0}{O}\rightarrow\overset{+4}{C}\ \overset{-2}{O_2}$

কার্বনের মোট জারণ-সংখ্যা বৃদ্ধি $=(4-0)=4$

অক্সিজেনের মোট জারণ-সংখ্যার হ্রাস $=0-2(-2)=4$

যেহেতু জারণ-সংখ্যার হ্রাস-বৃদ্ধি সমান, সুতরাং সমীকরণ : $C+O_2=CO_2$

উদাহরণ : (খ) জিংক ও লঘু হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের বিক্রিয়ায় জিংক, অ্যাসিডকে হাইড্রোজেনে বিজারিত করে এবং নিজে ক্লোরিনের সঙ্গে যুক্ত হ'য়ে জিংক ক্লোরাইডে জারিত হয়।

$\overset{0}{Zu}+\overset{+1}{H}Cl\rightarrow\overset{+2}{Zu}Cl_2+\overset{0}{H_2}$ (অসম্পূর্ণ)

এখানে মৌল জিংক এবং জিংক ক্লোরাইডে জিংক পরমাণুর জারণ-সংখ্যা যথাক্রমে শূন্য (0) এবং (+2), অর্থাৎ জারণ ক্রিয়ায় জিংক পরমাণুর জারণ সংখ্যা 2 একক $(0\rightarrow+2)$ বৃদ্ধি পেয়েছে। আবার বিজারণ ক্রিয়ায় হাইড্রোজেন পরমাণুর জারণ সংখ্যা। একক $(+1\rightarrow0)$ হ্রাস পায়। সুতরাং বৃদ্ধি এবং হ্রাসের সমতা বিধানের জন্যে বিকারকে 2টি হাইড্রোজেন প্রয়োজন।

$\therefore\ Zu+2HCl=ZuCl_2+H_2$ (সুসমঞ্জস সমীকরণ)

উদাহরণ : (গ) হাইড্রোজেন সালফাইড ফেরিক ক্লোরাইডকে ফেরাস ক্লোরাইডে বিজারিত করে নিজে সালফারে জারিত হয়।

$\overset{+3}{Fe}\ Cl_3+H_2\overset{-2}{S}\rightarrow\overset{+2}{Fe}Cl_2+HCl+\overset{0}{S}$ (অসম্পূর্ণ)

এখানে আয়রনের জারণ-সংখ্যা হ্রাস — । $(+3\rightarrow+2)$ এবং সালফারের জারণ-সংখ্যা বৃদ্ধি $+2(-2\rightarrow0)$

হ্রাস-বৃদ্ধির সমতা বজায় রাখবার জন্যে 2টি আয়রন পরমাণু প্রয়োজন।

$\therefore$ সুসমঞ্জস সমীকরণটি হবে $2FeCl_3+H_2S=2FeCl_2+2HCl+S$

উদাহরণ : (ঘ) অ্যাসিডযুক্ত পটাসিয়াম ডাইক্রোমেট দ্রবণের মধ্যে H_2S গ্যাস পরিচালিত করলে পাওয়া যায় পটাসিয়াম সালফেট, ক্রোমিক সালফেট এবং সালফার। সংকেত দ্বারা লিখলে :—

$K_2\overset{+6}{Cr_2}O_7+H_2\overset{-2}{S}\rightarrow K_2SO_4+\overset{+3}{Cr_2}(SO_4)_3+\overset{0}{S}$

এখানে দেখা যায় যে $K_2Cr_2O_7$ এ জারণ-সংখ্যা $=(+6)$ $Cr_2(SO_4)_3$ এর মধ্যে Cr এর জারণ-সংখ্যা $=(+3)$.

অতএব Cr এর জারণ-সংখ্যা $(+6)$ থেকে $(+3)$তে পরিবর্তিত হয়। H_2S এ সালফারের জারণ-সংখ্যা $=(-2)$ এবং মুক্ত সালফারের জারণ-সংখ্যা $=0$. অতএব S-এর জারণ-সংখ্যা (-2) থেকে বদলে শূন্য (0) হয়।

এখন, প্রতি অণু H_2S-এ S-এর জারণ-সংখ্যা বৃদ্ধি $=0-(-2)=+2$ প্রতি অণু $K_2Cr_2O_7$ এ Cr এর জারণ-সংখ্যা হ্রাস $=[2\times(+3)-2\times(+6)]=(-6)$

এখন জারণ সংখ্যার মান অপরিবর্তিত রাখার জন্যে প্রতি H_2S অণুর সঙ্গে 3 গুণ করতে হবে। তখন সমীকরণটি দাঁড়াবে এইরকম : $K_2Cr_2O_7+3H_2S\rightarrow K_2SO_4+Cr_2(SO_4)_3+3S$

এখন দেখা যাচ্ছে যে, সমীকরণটিতে সমতা বিধানের জন্যে অ্যাসিডের অণুর দরকার। দেখা যায় যে, অ্যাসিডের

অণুর সংখ্যা 4 হলে সমতা আসে। অতএব সুসমঞ্জস রাসায়নিক সমীকরণটি এইরকম হবে :

$K_2Cr_2O_7 + 3H_2S + 4H_2SO_4 = K_2SO_4 + Cr_2(SO_4)_3 + 3S + 7H_2O$.

উদাহরণ : (ঙ) জিংকের সঙ্গে কস্টিক সোডার বিক্রিয়ায় সোডিয়াম-জিংকেট ও হাইড্রোজেন উৎপন্ন হয়।

$$\overset{0}{Zn} + NaO\overset{+1}{H} \rightarrow Na_2\overset{+2}{Zn}O_2 + \overset{0}{H}_2$$

এখানে Zn এর জারণ-সংখ্যা বৃদ্ধি $= +2 - O = +2$

H_2 এর জারণ-সংখ্যা হ্রাস $= O - (+1) = -1$

∴ দেখা যায় 2টি NaoH অণুর প্রয়োজন।

অতএব সুসমঞ্জস রাসায়নিক সমীকরণটি হবে এইরকম :

$$Zn + 2NaOH = Na_2ZnO_2 + H_2$$

উদাহরণ : (চ) সালফার ডাই-অক্সাইড হাইড্রোজেন সালফাইডকে মৌল সালফারে জারিত করে এবং নিজেও বিজারিত হ'য়ে সালফার উৎপন্ন করে।

$$\overset{+4}{S}O_4 + H_2\overset{-2}{S} \longrightarrow \overset{0}{S} + H_2O + \overset{0}{S} \text{ (অসম্পূর্ণ)}$$

এখানে SO_2 এর S-এর জারণ সংখ্যার হ্রাস $= -4$ $(+4 \rightarrow O)$

এবং H_2S এর S-এর জারণ-সংখ্যা বৃদ্ধি $= +2(-2 \rightarrow O)$

জারণ-সংখ্যার হ্রাস-বৃদ্ধির সমতা রক্ষা করবার জন্যে 2টি H_2S অণুর প্রয়োজন।

অতএব সুসমঞ্জস রাসায়নিক সমীকরণটি হবে এইরকম : $SO_2 + 2H_2S = 3S + 2H_2O$

উদাহরণ : (ছ) ম্যাঙ্গানিজ ডাই-অক্সাইডের সঙ্গে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের বিক্রিয়ায় ম্যাঙ্গানিজ ক্লোরাইড, ক্লোরিন ও হাইড্রোজেন উৎপন্ন হয়।

$$\overset{+4}{Mn}O_2 + H\overset{-1}{Cl} \rightarrow \overset{+2}{Mn}\overset{-1}{Cl}_2 + \overset{0}{Cl}_2 + \overset{0}{H}_2$$

Mn এর জারণ-সংখ্যা হ্রাস $= (+2) - (+4) = -2$

Cl এর জারণ-সংখ্যা বৃদ্ধি $= O - (-1) = 1$

অতএব এক অণু ক্লোরিন উৎপন্ন করার জন্য 2 অণু HCl দরকার। কিন্তু যেহেতু বিক্রিয়াটিতে $MnCl_2$ এবং Cl_2 উৎপন্ন হয়, সেইহেতু 4 অণু HCl প্রয়োজন। অতএব সুসমঞ্জস রাসায়নিক সমীকরণটি হবে এই রকম :

$$MnO_2 + 4HCl = MnCl_2 + Cl_2 + 2H_2O.$$

'রাসায়নিক বিক্রিয়া' কাকে বলে, তা আগের অধ্যায়ে বলা হয়েছে। বলা হয়নি রাসায়নিক বিক্রিয়ার শ্রেণী বিভাগের কথা। এখন সেই কথা বলে এই অধ্যায়ের সমাপ্তি ঘটাবো।

রাসায়নিক বিক্রিয়ার শ্রেণী বিভাগ :

রাসায়নিক বিক্রিয়াগুলিকে কয়েকটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়, যেমন :

(i) **প্রত্যক্ষ সংযোগ :** এই ধরনের বিক্রিয়ায় কোন যৌগ তার উপাদানগুলির প্রত্যক্ষ সংযোগে গঠিত হয়।

যথা, $2Mg + O_2 = 2MgO$

$C + O_2 = CO_2$

(ii) **বিশ্লেষণ :** এই ধরনের বিক্রিয়ায় কোন পদার্থের অণু ভেঙে একাধিক সরল অণু গঠিত হয়।

যথা, $ZuCO_3 = ZuO + CO_2$

$2H_2O = 2H_2 + O_2$

(iii) **বিপরিবর্ত ক্রিয়া :** এই ধরনের বিক্রিয়ায় দু'টি যৌগিক পদার্থ পরস্পরের উপাদানের স্থান বিনিময় ক'রে নতুন নতুন পদার্থ গঠন করে।

যথা, $NaCl + AgNo_3 = AgCl + NaNo_3$

$Ba(NO_3)_2 + H_2SO_4 = BaSO_4 + 2HNG_3$

(iv) **প্রতিস্থাপন বিক্রিয়া :** এই ধরনের বিক্রিয়ায় কোন যৌগের মধ্যেকার কোনও একটি মৌল অপর কোন মৌল দ্বারা বিচ্যুত হয় এবং অপর মৌলটি ঐ মৌলের স্থান অধিকার করে।

যথা, $Fe + CuSO_4 = FeSO_4 + Cu$

$Zu + H_2SO_4 = ZuSO_4 + H_2$

(v) **যুত বিক্রিয়া :** এই ধরনের বিক্রিয়ায় কোন যৌগের অণু অপর কোন পদার্থের অণুর সঙ্গে সরাসরি যুক্ত হয় এবং অণু দু'টির কোন অংশই বিশ্লিষ্ট হয় না।

যথা, $CO + Cl_2 = COCl_2$

(vi) **উভমুখী বিক্রিয়া :** এই ধরনের বিক্রিয়ায় বিকারক পদার্থ থেকে উদ্ভূত পদার্থগুলি আবার বিকারক পদার্থে পরিণত হয়। সমীকরণে এই দুই বিপরীত ক্রিয়া প্রকাশ করার জন্যে বিকারক ও বিক্রিয়াজাত পদার্থের মধ্যে উভমুখী চিহ্ন (⇌) বসানো হয়।

যথা, $NH_4Cl \rightleftharpoons NH_3 + HCl$

$H_2 + I_2 \rightleftharpoons 2HI$

(vii) **পারমাণবিক পুনর্গঠন বিক্রিয়া ঃ** এই ধরনের বিক্রিয়ায় একটি যৌগের অণুর মধ্যে যে পরমাণুগুলি আছে, সেগুলি নতুনভাবে সজ্জিত হ'য়ে নতুন ধর্মের অণু গঠন করে।

যথা, $NH_4CNO \longrightarrow O=C\begin{smallmatrix} NH_2 \\ NH_2 \end{smallmatrix}$
(অ্যামোনিয়াম সায়ানেট) (ইউরিয়া)

॥ প্রশ্নাবলী ॥

1. নিম্নলিখিত সমীকরণগুলিকে সম্পূর্ণ ও সুসমঞ্জস কর ঃ—

(ক) $NH_3 + NaOCl \rightarrow N_2 + NaCl + —$

(খ) $NH_3 + O_2 \rightarrow — + H_2O.$

(গ) $Fe + HNO_3 \rightarrow — + NO_2 + H_2O$

(ঘ) $CuO + NH_3 \rightarrow Cu + — + H_2O$

(ঙ) $(NH_4)_2SO_4 + Ca(OH)_2 \rightarrow CaSO_4 + — + H_2O$

(চ) $NaOH + Cl_2 \rightarrow NaCl + — + H_2O$

(ছ) $KMnO_4 + H_2SO_4 \rightarrow — + MnSo_4 + H_2O + O$

(জ) $KI + H_2SO_4 \rightarrow KHSO_4 + SO_2 + — + H_2O$

2. জারণ-সংখ্যার সাহায্যে নিম্নলিখিত সমীকরণগুলিকে ব্যালান্স কর ঃ—

(ক) $P + HNO_3 + H_2O \rightarrow H_3PO_4 + NO$

(খ) $Sn + HNO_3 \rightarrow SnO_2 + NO + H_2O$

(গ) $HNO_3 + H_2S \rightarrow NO + H_2SO_4 + H_2O$

(ঘ) $H_2O_2 + KI + HCl \rightarrow KCl + I_2 + H_2O$

(ঙ) $Zn + NaOH + NaNO_3 \rightarrow Na_2ZnO_2 + NH_3 + H_2O.$

(চ) $KMnO_4 + H_2SO_4 + H_2S \rightarrow K_2SO_4 + MnSO_4 + H_2O + S$

3. নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে কি ধরনের বিক্রিয়া ঘটে তা সুসমঞ্জস সমীকরণ সহযোগে ব্যাখ্যা কর ঃ—

(ক) জলন্ত ম্যাগনেসিয়ামকে কার্বন ডাই-অক্সাইডপূর্ণ গ্যাস জারে প্রবেশ করানো হলো।

(খ) বেরিয়াম কার্বনেটকে উত্তপ্ত করা হলো।

(গ) লঘু H_2SO_4 মিশ্রিত $KMnO_4$ দ্রবণে H_2O_2 যোগ করা হলো।

(ঘ) দীর্ঘকাল যাবৎ স্বচ্ছ চুন-জলে কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস পরিচালনা করা হলো।

(ঙ) গাঢ় ও উত্তপ্ত কস্টিক সোডা দ্রবণে ক্লোরিন গ্যাস পরিচালনা করা হলো।

4. নিম্নলিখিত বিক্রিয়াগুলিতে কোন্ বিকারকগুলি জারিত/বিজারিত হয়েছে ?

(ক) $PCl_3 + Cl_2 = PCl_5$

(খ) $KIO_3 + 5KI + 6HCl = 3I_2 + 6KCl + 3H_2O$

(গ) $2CuSO_4 + SO_2 + 3KBr + 2H_2O = 2CuBr + 2H_2SO_4 + K_2SO_4$

(ঘ) $Si + 2KOH + H_2O = K_2SiO_3 + 2H_2$

(ঙ) $AlCl_3 + 3K = Al + 3KCl$

(চ) $SO_2 + 2H_2S = 3S + 2H_2O$

5. আংশিক সমীকরণ পদ্ধতিতে নিম্নলিখিত সমীকরণগুলিকে ব্যালান্স কর ঃ

(ক) $KI + H_2O_2 \rightarrow KOH + I_2$

(খ) $Cl_2 + H_2O + H_2S \rightarrow HCl + S + H_2O$

(গ) $Br_2 + KOH \rightarrow KBr + KBrO_3 + H_2O$

(ঘ) $HNO_3 + H_2S \rightarrow NO_2 + H_2O + S$

(ঙ) $H_2SO_4 + HI \rightarrow S + I_2 + H_2O.$

(চ) $P + Br_2 + H_2O \rightarrow KBr + H_3PO_4$

(ছ) $Fe_3O_4 + H_2SO_4 \rightarrow FeSO_4 + Fe_2(SO_4)_3 + H_2O.$

6. শর্ত উল্লেখ ক'রে নীচের বিক্রিয়াগুলিকে সুসমঞ্জস ও সম্পূর্ণ কর ঃ

(ক) $Al + HCl = ...$

(খ) $Al + KOH = ...$

(গ) $Al + H_2SO_4 = ...$

7. নীচের শূন্য স্থানগুলিকে সঠিকভাবে পূরণ কর ঃ—

(ক) $NaNO_3$ যৌগে নাইট্রোজেনের জারণ মাত্রা——

(খ) ক্রায়োলাইট এর আণবিক সংকেত ——

(গ) HIO_3 যৌগে আয়োডিনের জারণ-সংখ্যা ——

(ঘ) স্ট্যানাস ক্লোরাইড দ্রবণের সঙ্গে ফেরিক ক্লোরাইড দ্রবণের বিক্রিয়ায় স্ট্যানাস ক্লোরাইড জারিত হয়ে — যৌগে পরিণত হয়।

(ঙ) $CaO + 3C \rightarrow CaC_2 + CO\uparrow$ বিক্রিয়াটি ঘটাতে —— ডিগ্রী সেলসিয়াস উষ্ণতার প্রয়োজন হয়।

ছায়ার মজা—মজার ছায়া

ডঃ অলক চক্রবর্তী

হাতের নানারকম ভঙ্গিমা করে আলোর সামনে ধরে দেওয়ালে নানারকম মজার ছায়া তোমরা নিশ্চয়ই ফেলেছ। ছবিতে দেখ—কুকুর, খরগোশ, পেঙ্গুইন আর উড়ন্ত ঈগলের ছায়া। দেখতে খুবই মজা লাগছে সত্যি কিন্তু ছায়া ব্যাপারটা কী!

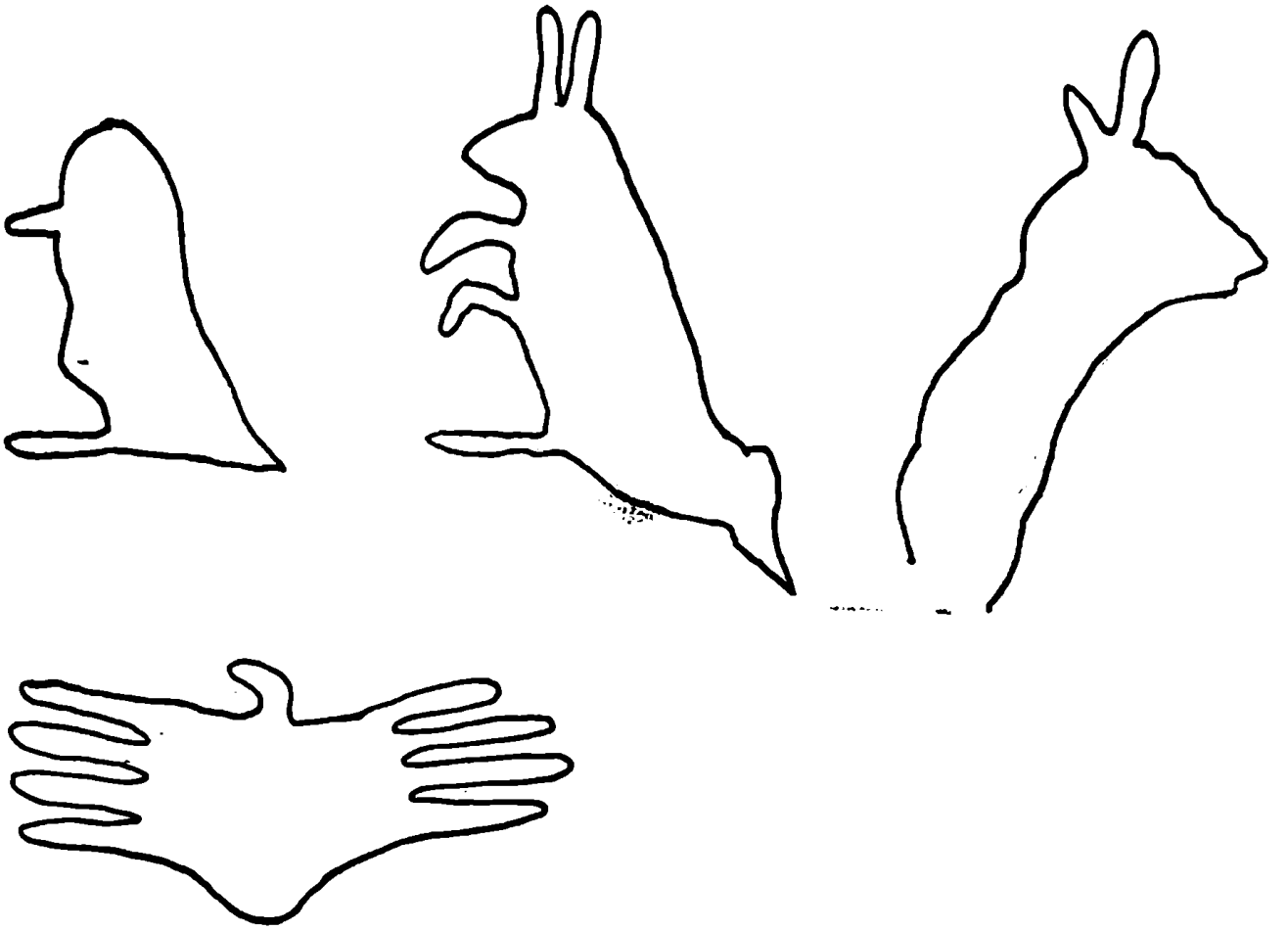

চিত্র—১, ২, ৩, ৪।

আলোকের গতিপথে কোন অস্বচ্ছ বস্তু রাখলে আলোক রশ্মি ঐ অস্বচ্ছ বস্তুর ভিতর দিয়ে যেতে পারে না। সেই জন্য অস্বচ্ছ বস্তুর পিছন দিকে খানিকটা জায়গা জুড়ে একটা অন্ধকারময় অংশের সৃষ্টি হয়। ঐ অংশে যদি কোন পর্দা ধরা হয় তাহলে ঐ পর্দায় একটা কালো প্রতিকৃতি পড়ে। ঐ প্রতিকৃতিকে ঐ অস্বচ্ছ বস্তুর ছায়া বলে।

আমরা যে মজার ছবিগুলো দেখছি এগুলিতে হাত হচ্ছে অস্বচ্ছ বস্তু আর দেওয়ালে পড়ছে ছায়া।

আলোক উৎসের মাপ, অস্বচ্ছ বস্তুর আকৃতি, অস্বচ্ছ বস্তু থেকে উৎস অথবা পর্দার দূরত্ব অনুযায়ী ছায়ার প্রকার ভেদ হয়।

যদি একটা বিন্দু উৎসের (S) সামনে কোন গোলাকার পিজবোর্ড (AB) রাখা হয় তাহলে পেছনের পর্দায় (MN) একটা গোল ছায়া পড়বে। (চিত্র নং 5) পর্দা যত দূরে ধরা হবে ছায়ার মাপও তত বড় হবে। আবার আলোর উৎস যত দূরে সরানো হবে ছায়ার মাপও তত ছোট হবে। এটা তো সহজেই পরীক্ষা করে দেখতে পারো। আচ্ছা, যদি গোল পিজবোর্ডকে আস্তে আস্তে ঘোরাতে থাকো অর্থাৎ খাড়া অবস্থান থেকে আস্তে আস্তে ঘুরিয়ে সমতলে আনো তাহলে ছায়ার অবস্থা কিরকম ভাবে বদলাবে

বলতে পারো ? বলেই দেখ না।

আলোকের বিন্দুর উৎস পাওয়াতো খুবই মুশকিল, তাই উৎস বড় হলে ছায়ার অবস্থা কি হবে একটু ভাবা যাক।

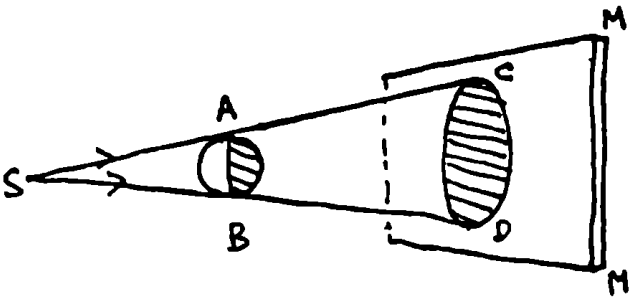

চিত্র—৫

6নং ছবিতে AB হচ্ছে আলোক উৎস। এর প্রত্যেকটি বিন্দু থেকেই আলোক বেরোচ্ছে। CD হচ্ছে অস্বচ্ছ বস্তু। A বিন্দুর জন্য পর্দায় GE অংশের ছায়া সৃষ্টি হবে আবার B বিন্দুর জন্য GF অংশের ছায়ার সৃষ্টি হবে। A ও B-র মধ্যবর্তী যে কোন আলোকবিন্দুর কথা ভাবলে দেখা যাবে যে OF অংশ সবসময়ই অন্ধকার থাকবে। কিন্তু A-র জন্য GF অংশে এবং B-র জন্য EF অংশে কিছু আলোক

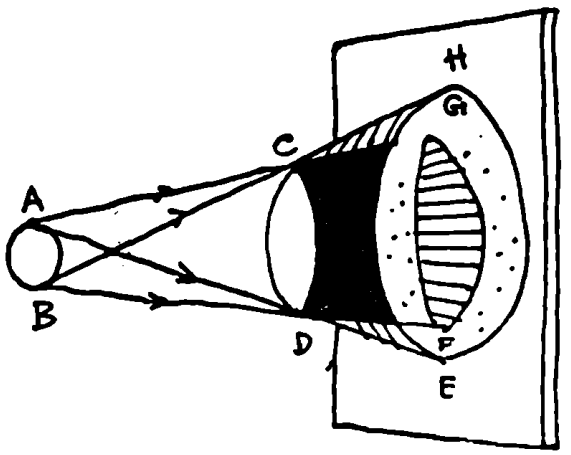

চিত্র—৭

পড়বে। অর্থাৎ এক্ষেত্রে ছায়ার ধরনটা একটু পাল্টে গেল।

পর্দার উপরে আমরা একটা ঘন অন্ধকার জায়গা আর চারদিকে আংশিক আলোকযুক্ত আরেকটা জায়গা দেখব। সম্পূর্ণ অন্ধকার জায়গাকে প্রচ্ছায়া বলে আর আংশিক আলোকযুক্ত জায়গাকে উপচ্ছায়া বলে।

উপচ্ছায়া অঞ্চলে কিন্তু সর্বত্র সমান অন্ধকার নয়, প্রচ্ছায়া অঞ্চল থেকে বাইরের দিকে ধীরে ধীরে অন্ধকারের পরিমাণ কমতে থাকে। এবার আরও ভাবা যাক। আলোক উৎস অস্বচ্ছ বস্তুর চেয়ে অনেক বড় হলে কি হবে ? 7নং ছবিতে AB একটি বিস্তৃত উৎস, CD অস্বচ্ছ বস্তু যেটি AB-র থেকে অনেক ছোট। উৎসের A বিন্দু থেকে CD বস্তুর উপর আঁকা AEH শঙ্কু অন্ধকার হবে। এবং

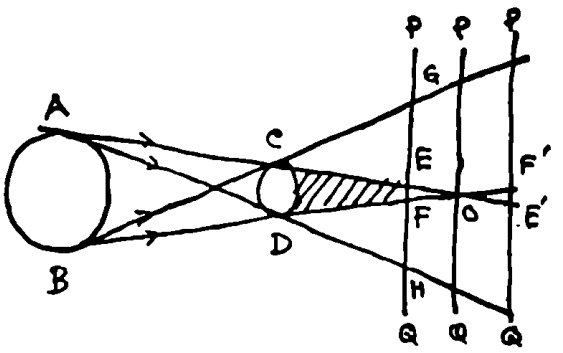

চিত্র—৬

উৎসের B বিন্দুর জন্য BGF শঙ্কু অন্ধকার হবে। এখন ছায়ার ধরন কিরকম হবে সেটা নির্ভর করছে পর্দা কোথায় রাখা হবে। পর্দা PQ-এর তিনটি বিভিন্ন অবস্থান ছবিতে দেখানো হয়েছে। প্রথম অবস্থানে আমরা প্রচ্ছায়া এবং উপচ্ছায়া পাব। প্রচ্ছায়া অর্থাৎ (EF) এবং উপচ্ছায়া অর্থাৎ (GE, FH) পাব। অর্থাৎ EF অংশ সম্পূর্ণ

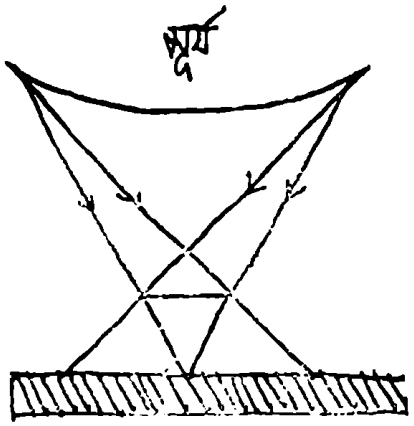

চিত্র—৮

অন্ধকার থাকবে এবং GE এবং FH অংশ আংশিক আলোক যুক্ত থাকবে। PQ এর দ্বিতীয় অবস্থানে প্রচ্ছায়া একটা বিন্দুর মত হবে আর বাকী সমস্তটাই হবে উপচ্ছায়া।

কোন পাখি বা বিমান যদি মাটি থেকে অনেক উঁচু দিয়ে উড়ে তখন আকাশে সূর্য থাকা সত্ত্বেও এর ছায়া মাটিতে পড়বে না 8নং ছবি দেখলে এটা বুঝতে পারবে।

আমরা যে গ্রহণের কথা বলি সেটা আলোছায়া সংক্রান্ত প্রাকৃতিক ঘটনা মাত্র। এই গ্রহণই হচ্ছে সূর্য,

পৃথিবী ও চন্দ্রের পর্যায়ে প্রচ্ছায়া ও উপচ্ছায়ার খুব ভাল উদাহরণ।

পৃথিবী তার কক্ষপথে সূর্যের চারদিকে ও চন্দ্র তার কক্ষপথে পৃথিবীর চারদিকে ঘুরছে। এইভাবে ঘুরতে ঘুরতে সূর্য ও পৃথিবীর ভেতর যদি চন্দ্র এসে পড়ে তখন সূর্যকে দেখা যায় না। আবার সূর্য ও চন্দ্রের ভেতর পৃথিবী এসে পড়লে চন্দ্রকে দেখা যায় না। এদেরই যথাক্রমে সূর্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণ বলে। এবার দুটো প্রশ্ন আলোচনা করা যাক।

প্রথম প্রশ্ন : স্পষ্ট ছায়া পেতে হলে একটি পেন্সিলকে টেবিলের উপর কিভাবে রাখতে হবে যদি আলোক উৎস দিনের আলো না হয়ে মাথার উপরে রাখা টিউব লাইট হয়। পেন্সিলটিকে টিউবের সঙ্গে সমান্তরাল ধরতে হবে এবং তারপর যে টেবিলের উপর টিউব লাইট আছে তার যত কাছাকাছি সম্ভব এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। কিন্তু কেন বল তো? আরও ভাব যদি পেন্সিলটিকে টিউব লাইটের সঙ্গে সমান্তরাল করে রাখা হয় তাহলে কি হবে?

দ্বিতীয় প্রশ্ন : মাটিতে কোন মানুষের ছায়া পড়লে দেখা যায় যে পায়ের ছায়া পরিষ্কার বা তীক্ষ্ণ হয় কিন্তু মাথার ছায়া পাতলা বা বিক্ষিপ্ত হয়। কেন এরকম ঘটে?

তুমি নিজে এরকম ছায়া সহজেই দেখতে পাবে। আসলে একটি বিবর্ধিত উৎসের আলাদা আলাদা অংশ থেকে ছায়াগুলি এমনভাবে উৎপন্ন হয় যে তারা একে অন্যের উপরে পড়ে। যে তলের উপর ছায়া পড়ছে সেই তল এবং ছায়া সৃষ্টিকারী বস্তুর মধ্যে দূরত্ব যতই কমে ততই ছায়ার ধারগুলি (edge) তীক্ষ্ণ হয়। পায়ের দূরত্ব মেঝে থেকে সবচেয়ে কম এবং মাথার দূরত্ব সবচেয়ে বেশী। তাই পায়ের ছায়া তীক্ষ্ণ আর মাথার ছায়া বিক্ষিপ্ত হয়।

[পরবর্তী সংখ্যায় আলোকের প্রতিফলন সম্বন্ধে আলোচনা করা হবে।]

৬সি নলিন সরকার স্ট্রীট, কলি-৪

কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান আয়োজিত

রচনা প্রতিযোগিতা

মান : ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণী

প্রথম পুরস্কার ২৫, দ্বিতীয় ২০, তৃতীয় ১৫

বিষয় সূচী

ষষ্ঠ শ্রেণী : পরিচিত পাখি ॥ শব্দ সংখ্যা ২৫০

সপ্তম শ্রেণী : প্রিয় বিজ্ঞানী ॥ শব্দ সংখ্যা ৩০০

অষ্টম শ্রেণী : গাছের মূল্য ॥ শব্দ সংখ্যা ৪০০

নিয়মাবলী

[এক] মার্জিন সহ পৃষ্ঠার একদিকে পরিষ্কার হস্তাক্ষরে রচনা লিখে পাঠাতে হবে।

[দুই] নীচের কুপনটি পূরণ করে রচনার সঙ্গে পাঠাতে হবে।

[তিন] প্রেরিত রচনার ফেরত পাঠানো সম্ভব হবে না : পুরস্কৃত রচনা কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞানে প্রকাশিত হবে।

কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞানের দপ্তরে রচনা পাঠাবার শেষ তারিখ :—৩১শে মার্চ ১৯৮২

কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান

প্রতিযোগীর নাম :..... .....বয়স.....

ঠিকানা :.....

বিদ্যালয়ের নাম ঠিকানা :.....

শ্রেণী.....রচনার বিষয় .....

প্রতিযোগী স্বাক্ষর.....

প্রধান শিক্ষক/শিক্ষিকার স্বাক্ষর.....

প্রথম আর্যভট

নন্দলাল মাইতি

তোমরা সবাই আর্যভটের নাম শুনে থাকবে। প্রথম যে কৃত্রিম উপগ্রহ দিয়ে ভারতের মহাকাশ অভিযান আরম্ভ হয়, তার নাম আর্যভট। আর্যভট প্রাচীন ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গণিতবিদ ও জ্যোতির্বিদ।

অনেক পত্র-পত্রিকায় 'আর্যভট' ও 'আর্যভট্ট' এই দুটি নাম দেখা যায়। এরূপ মনে হতে পারে কোনটি ঠিক, 'আর্যভট' না আর্যভট্ট? সত্যি কথা বলতে কি, আর্যভট বলাই যুক্তিসঙ্গত, আর্যভট্ট বলা উচিত নয়। তবে অনেকে 'ভট্ট' উচ্চারণ করেন এইজন্য যে নামের সঙ্গে 'ভট্ট' যুক্ত অনেক নাম পাওয়া যায়। যেমন, বান ভট্ট, ভবদেব ভট্ট, কুমারিল ভট্ট, যদু ভট্ট ইত্যাদি। 'ভট্ট'-এর সঙ্গে অধিক পরিচিত বলে 'ভট' আমাদের যেন মনঃপূত হয় না। 'ভট্ট' শব্দের প্রকৃত অর্থ ভট্ট ব্রাহ্মণ, অন্য লোকদের যশোগান করাই এদের উপজীবিকা। চলতি কথায় এদের ভাট ব্রাহ্মণ বলে। তাই আর্যভট্ট উচ্চারণ না করে আর্যভট বলাই যুক্তিপূর্ণ।

একই নামে অনেক লোক থাকতে পারে। এমন কি নাম ও পদবীতে মিল লোকেরও অভাব নাই। তেমনি প্রাচীন ভারতে আর্যভট নামে একাধিক গণিতবিদ্ ও জ্যোতির্বিদ ছিলেন। তাঁদের মধ্যে আমাদের আলোচ্য আর্যভট আগে জন্মেছিলেন বলে তাঁকে প্রথম আর্যভট বলা হয়। আর একজন আর্যভটের কথা আমরা আলোচনা করব যিনি দ্বিতীয় আর্যভট নামে পরিচিত।

গুপ্তযুগকে ভারতের ইতিহাসে স্বর্ণ-যুগ বলা হয়। এই সময় দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা ভাল ছিল, শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় ছিল আর রাজারাও ছিলেন সুযোগ্য। মোট কথা, তখন জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার বেশ অনুকূল পরিবেশ ছিল। তাই কাব্য-সাহিত্য ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের নানা ক্ষেত্রে তখন প্রতিভাবান ব্যক্তিদের আবির্ভাব হয়। এই রকম অবস্থায় আর্যভট বিহারের অন্তর্গত কুসুমপুরে, ইতিহাসে যার নাম পাটলিপুত্র, আর এখন যাকে আমরা পাটনা বলি তার কাছে 476 খ্রীস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন।

অতি অল্প বয়সেই তাঁর প্রতিভার পরিপূর্ণ বিকাশ হয়। মাত্র তেইশ বছর বয়সে তিনি একটি অসামান্য গ্রন্থ রচনা করেন। এই গ্রন্থটির নাম "আর্যভটীয়"।

একশ' একুশটি শ্লোকে রচিত 'আর্যভটীয়' একখানি ক্ষুদ্র গ্রন্থ। এই গ্রন্থের চারটি অংশ,—গীতিকাপাদ, গণিতপাদ, কালক্রিয়াপাদ ও গোলপাদ। গীতিকাপাদে তিনি বর্ণমালার সাহায্যে সংখ্যা প্রকাশের এক ধরনের পদ্ধতির কথা বলেছেন; কালক্রিয়া ও গোল অধ্যায়ে জ্যোতির্বিজ্ঞানের নীতি ও গণনার সংক্ষিপ্ত পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করেছেন; গণিতপাদে মাত্র তেত্রিশটি শ্লোকে তিনি বিশুদ্ধ গণিত বিষয়ে আলোচনা করেছেন।

আজ থেকে প্রায় দেড় হাজার বছর আগে আচার্য আর্যভট গণিতের কি কি বিষয়ের উল্লেখ করেছিলেন তা জেনে নেওয়া যাক। তিনি বর্গ, বর্গমূল, ঘন, ঘনমূল, ত্রিভুজ, ট্রাপিজিয়াম ইত্যাদির ক্ষেত্রফল, বৃত্ত, পিরামিডের আয়তন, সমান্তর শ্রেণী ও শ্রেণীর সমষ্টি নির্ণয়, সুদকষা, ত্রৈরাশিক, ভগ্নাংশ, ত্রিকোণমিতির সাইন তালিকা প্রস্তুতি, দ্বিঘাত সমীকরণ, একঘাত অনির্ণেয় সমীকরণ ইত্যাদি বিষয়ে খুব সংক্ষেপে আলোচনা করেছেন। কিন্তু যেসব গাণিতিক আবিষ্কারে আর্যভটের কৃতিত্ব সর্বাধিক, তা হচ্ছে- পাই (π)-এর মান নির্ণয়, বর্ণমালার সাহায্যে সংখ্যা প্রকাশের পদ্ধতি, সাইন তালিকা প্রস্তুতি এবং এক ঘাত অনির্ণেয় সমীকরণের সমাধান পদ্ধতি।

আর্যভটের দু'একটি কৃতিত্বের কথা

বর্গমূল নির্ণয়

তোমরা সবাই বর্গমূল নির্ণয় করতে জান। আর বর্গমূল নির্ণয়ের দুটি পদ্ধতি শিখেছ। একটি উৎপাদক বিশ্লেষণ করে, আর অপরটি অপেক্ষাকৃত জটিল পদ্ধতি অবলম্বন করে। শেষেরটি জটিল এইজন্য যে, প্রদত্ত সংখ্যাটি বড় হলে তখন ভীষণ অসুবিধার মাঝে পড়তে হয়। কিন্তু আচার্য আর্যভট বর্গমূল নির্ণয়ের এমন একটি পদ্ধতির কথা বলেছেন যা অত্যন্ত সহজ ও সরল। এতে কোন জটিলতা নাই। কেবল সাধারণ ভাগ করে গেলেই হলো!

প্রচলিত পদ্ধতিতে যেমন তোমরা প্রদত্ত সংখ্যার ডানদিক থেকে জোড়া করে নাও, এখানে জোড়া করতে হবে না। তার বদলে ডানদিক থেকে প্রতিটি অঙ্কের উপর প্রথমে উল্লম্ব রেখা, পরে অনুভূমিক রেখা দিয়ে চিহ্নিত করতে হবে। উল্লম্ব রেখাগুলি হবে অযুগ্মস্থান

আর অনুভূমিক রেখাগুলি হবে যুগ্ম-স্থান। এবার আর্যভটের নিয়মটি বলি :

"যুগ্ম-স্থানে সর্বদা মূলের দ্বিগুণ দ্বারা ভাগ করতে হবে ; অযুগ্ম-স্থানে সর্বদা বিয়োগ করে ভাগফল পূর্ববর্তী মূল-রেখায় বসিয়ে বর্গমূল নির্ণীত হবে।"

কি, বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে তো ? নীচের উদাহরণটি ভাল করে লক্ষ্য করে নিয়মের সঙ্গে মিলিয়ে নাও, তা হলে বুঝতে অসুবিধা হবে না।

উদাহরণ : বর্গমূল নির্ণয় কর : 54756

1) নিকটতম বর্গ অঙ্কটি বিয়োগ
2) মূলের দ্বিগুণ দ্বারা ভাগ $2\times2=4$
3) ভাগফলের বর্গ দ্বারা বিয়োগ $3^2=9$
4) মূলের দ্বিগুণ দ্বারা ভাগ $23\times2=46$
5) ভাগফলের বর্গ দ্বারা বিয়োগ $4^2=16$

```
 ।  ―  ।  ―  ।
 5  4  7  5  6 ( মূল = 2
 4
4) 14 (3 = মূলের পরবর্তী অঙ্ক
   12
   27
    9
46) 185 (4 = মূলের পরবর্তী অঙ্ক
-)  184
     16
     16
      ×
```

∴ নির্ণেয় বর্গমূল = 234।

এই বর্গমূল নির্ণয়ে পাঁচটি সোপান আছে বটে, কিন্তু আসলে দুটি। দেখ, 1নং ও 2নং নিয়মই পর্যায়ক্রমে এসেছে। বর্গমূল নির্ণয়ের এর চেয়ে সহজ ও সরল পদ্ধতি আর নাই।

বর্ণমালার সাহায্যে সংখ্যা প্রকাশ

আচার্য আর্যভট বর্ণমালার বিভিন্ন "বর্ণ" (যেমন ক, খ, গ ইত্যাদি) দিয়ে সংখ্যা প্রকাশ করার একরকম পদ্ধতি আবিষ্কার করেন। আর্যভট্ট কৃত দু'একটি বর্ণ-সংখ্যা •

i) 'ঘৃ' = (ঘ + ঋ) = 4×10^6 ; ঘ = 4, ঋ = 10^6

ii) 'খ্যুঘৃ' = $2\times10^4+3\times10^5+4\times10^6=$ 4,320,000

পাই (π)-এর মান

অতি প্রাচীনকাল থেকেই সারা বিশ্বে "পাই" সংখ্যাটি বড় রহস্যময় হয়ে দেখা দিয়েছিল। গণিত ও জ্যোতির্বিজ্ঞানে এর প্রয়োগ করতেই হয়। তাই এর সঠিক মান জানা দরকার। প্রাচীনকালে আর্যভট এই রহস্যময় সংখ্যাটির দশমিক চার স্থান পর্যন্ত সঠিক মান নির্ণয় করতে পেরেছিলেন। এটা তাঁর যেমন কৃতিত্ব, তেমনি আমাদের গৌরবের ও গর্বের। আচার্য আর্যভটের নিয়মটি এরকম :

"একশ'-র সঙ্গে 4 যোগ করে 8 দিয়ে গুণ করে 62,000 যোগ কর। এই ফলটি 20,000 ব্যাস-বিশিষ্ট বৃত্তের আনুমাণিক পরিধি হবে।"

অঙ্কে তো কথা কম, সংখ্যা ও প্রতীক দিয়ে সব কিছু বোঝানো হয়। তাই উপরের নিয়মটি গণিতের ভাষায় প্রকাশ করলে,—

$$\pi\ (\text{পাই}) = \frac{\text{পরিধি}}{\text{ব্যাস}} = \frac{8\ (100+4)+62{,}000}{20{,}000} = 3\cdot1416$$

আর্যভট অবশ্য π-এর মান ভগ্নাংশে প্রকাশ করেছিলেন। কারণ, তখনো পর্যন্ত দশমিক চিহ্নের আবিষ্কার হয়নি। আর দশমিক চিহ্ন আমাদের দেশেও আবিষ্কৃত হয়নি,— হয়েছিল পাশ্চাত্য দেশে, ইউরোপে।

আচার্য আর্যভট কেবলমাত্র গণিতবিদ ছিলেন না, তিনি ছিলেন অন্যতম শ্রেষ্ঠ জ্যোতির্বিজ্ঞানী। জ্যোতির্বিজ্ঞানে রয়েছে তাঁর অসামান্য অবদান। তোমরা তো পৃথিবীর আহ্নিক গতি ও বার্ষিক গতির কথা জান। কিন্তু বহুদিন ধরে মানুষ বিশ্বাস করেনি পৃথিবী নিজ অক্ষে প্রচণ্ড বেগে ঘুরছে,—আর ঘুরে ঘুরে সূর্য পরিক্রমা করছে। আর্যভটই প্রথম জ্যোতির্বিদ যিনি ঘোষণা করেছিলেন পৃথিবীর আহ্নিক গতি আছে। এটি একটি যুগান্তকারী আবিষ্কার। সে-যুগে এরকম কথা কেউ ভাবতেই পারেনি।

এখন যে মধ্যরাত্রি থেকে সময় গণনা করা হয়, তা বোধ হয় অনেকের জানা। অর্থাৎ আজ মঙ্গলবার হলে, আজকের রাত্রি বারোটার পর বুধবার পড়ে যাবে, আর মঙ্গলবার থাকবে না। আচার্য আর্যভট সর্বপ্রথম এই নতুন সময় গণনার পদ্ধতি উদ্ভাবন করেন। দেখ, তাঁর চিন্তা কিরকম সুদূরপ্রসারী ছিল।

ভারতীয় গণিতের ইতিহাসে আর্যভটের প্রতিভা বড় বিস্ময়কর। তাই পরবর্তীকালের গণিতবিদ ও জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা তাঁর সমালোচনা করলেও আরো অনেক গণিতজ্ঞ তাঁর মত ও পথ অবলম্বন করেছিলেন এবং তাঁর গ্রন্থের নানা টীকা-ভাষ্য রচনা করেছিলেন। এ'দের আর্যভটীয় গোষ্ঠী বলা হয়।

পোঃ ঠাকুরানীচক, হুগলী

বিজ্ঞান-বিচিত্রা ● অনীশ দেব

ঘড়ি চিনে নাও

দিনের পর দিন নিত্য নতুন বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব পৃথিবীতে আবিষ্কৃত হচ্ছে। নানান দেশের নানান বিজ্ঞানীরা তার জন্য বিশেষভাবে সম্মানিত হচ্ছেন। কেউ কেউ নোবেল জয়ের মতো দুর্লভ পুরস্কারও লাভ করেছেন। কিন্তু প্রশ্ন উঠতে পারে, এতো সব তত্ত্বের মধ্যে কোন্‌গুলো খুব ভালো, আর কোন্‌গুলো সাধারণ মাপের। তোমরা নিশ্চয়ই জানো, কোন বিজ্ঞানী নতুন কোন তত্ত্ব আবিষ্কার করলেই নোবেল জয়ের সম্মান লাভ করেন না। তাঁর তত্ত্ব বিজ্ঞানকে সমৃদ্ধ করে ঠিকই, তবে তার ফলাফল সুদূরপ্রসারী হয়তো নয়, বরং সীমাবদ্ধ। এই ভালো আর সাধারণ তত্ত্বের তফাৎ বোঝাতে গিয়ে খুব সুন্দর একটি উদাহরণ দেওয়া যায়।

ধরো আমার কাছে দুটো ঘড়ি আছে। তার একটা সম্পূর্ণ অচল, অর্থাৎ বন্ধ। আর দ্বিতীয়টা ঠিকমতো চললে কি হবে, যতোই কাঁটা ঘুরিয়ে ঠিক করো না কেন, রোজই পাঁচ-দশ মিনিট করে বেশি সময় দেখায়, অর্থাৎ ভুল সময় দেখায়।

এখন যদি তোমাকে বলা হয় দুটো ঘড়ির মধ্যে একটা বেছে নিতে, তুমি স্বাভাবিক ভাবেই সচল দ্বিতীয় ঘড়িটা বেছে নেবে. কিন্তু আমি বলবো প্রথম ঘড়িটা নির্ভুল। কারণ, চব্বিশ ঘণ্টায় সেটা অন্তত দু-দুবার সঠিক সময় দেয়। অথচ দ্বিতীয় ঘড়িটা লাগাতার ভুল সময় দেখিয়ে যাচ্ছে। সুতরাং. আরো একবার তোমাকে ভেবে দেখতে বলবো আমি।

কিন্তু না, তোমার মত পরিবর্তন করা এতো সহজ নয়। যেহেতু দ্বিতীয় ঘড়িটা চলছে, এবং ভুল হলেও তোমাকে সঠিক সময়ের মোটামুটি আন্দাজ দিচ্ছে, সেহেতু তুমি সেটাই বেছে নেবে।

অতএব, এখন নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছো, ভালো বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব কোন্‌টা, আর কোন্‌টা সাধারণ ?

প্রথম ঘড়িটা তোমাকে দিনে দু-বার ঠিক সময় দিচ্ছে বটে, কিন্তু কোন্‌টা যে ঠিক সময় তা জানা সম্ভব নয়। অর্থাৎ ঘড়িটা সময়ের আন্দাজ দিতে পারছে না, এবং তোমার কোন কাজেও আসবে না। কিন্তু দ্বিতীয় ঘড়িটা দু-পাঁচ মিনিটের হেরফেরে সময় দেখালেও তোমাকে যথেষ্ট সাহায্য করবে।

ভালো বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব হলো দ্বিতীয় ঘড়িটার মতো। এ জাতীয় তত্ত্বের সাহায্যে নানান্ ভবিষ্যদ্বাণী করা যায়, সেগুলো পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে খতিয়ে দেখা যায়, এক-কথায় তার ফলাফল সুদূরপ্রসারী। এই তত্ত্বের ভবিষদ্বাণী যদি নির্ভুল নাও হয় তাহলেও কোন ক্ষতি নেই, কারণ সেটা মোটামুটি ঠিক হলেই আমাদের, অথবা বিজ্ঞানের কাজে আসবে। অর্থাৎ, দ্বিতীয় ঘড়ির মতো মোটামুটি আন্দাজ দিলেই যথেষ্ট।

কিন্তু যে সব বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব নিভু ল অথচ কোনরকম ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারে না, অর্থাৎ. প্রথম ঘড়িটার মতো দু-দুবার নির্ভুল সময় দেখালেও সময়ের সঠিক কোন আন্দাজ দিতে পারে না, সেই সব তত্ত্বকে বলা যেতে পারে সাধারণ মাপের এবং সীমাবদ্ধ। সব তত্ত্বের সুদূরপ্রসারী কোন ক্ষমতা নেই।

তোমরা যদি কখনও বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব আবিষ্কারের দিকে মনোযোগী হও, তাহলে দেখো, সেই আবিষ্কার যেন দ্বিতীয় ঘড়িটার মতো সুদূরপ্রসারী হয়। অবশ্য একথাও মনে রেখো, কোন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারই ফেলনা নয়।

ওহ্‌ম-এর সূত্রের আবিষ্কারক

বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ক্ষেত্রে সারা পৃথিবীতে একটা আইন চালু আছে। আইনটা না জানা থাকলে এখন জেনে নাও। ধরো, কোন বিজ্ঞানী কোন আবিষ্কার করলেন। কিন্তু যে কোন কারণেই হোক, সেটা বাইরে প্রচার করলেন না. কাউকে জানালেন না, নিজের কাছেই গোপন রাখলেন। তারপর, দ্বিতীয় কোন বিজ্ঞানী হয়তো সেটা উদ্ধার করে কিছুদিন পর সবার সামনে প্রকাশ করলেন। তখন সেই আবিষ্কারটির সঙ্গে যে বিজ্ঞানীর নাম চিরতরে জড়িয়ে গিয়ে তাঁকে অমর করে রাখবে, তিনি হলেন দ্বিতীয় বিজ্ঞানী। যিনি আসল আবিষ্কারক, তাঁর নামটি কেউ আর উল্লেখও করবে না।

আবার একই আবিষ্কার যদি দুজন বিজ্ঞানী বিভিন্ন সময়ে করে থাকেন, তাহলে যিনি প্রথম সেই আবিষ্কারটিকে জনসমক্ষে হাজির করেন, তিনিই হবেন সেই আবিষ্কারের আবিষ্কর্তা।

এই বিচিত্র আইনের কারণ কিন্তু অতি সাধারণ। কোন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার গোপন রাখাটা একটা আন্তর্জাতিক অপরাধ। কারণ এই গোপনীয়তার ফলে বিজ্ঞান ক্ষতিগ্রস্ত হয়, ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে দেশ-কাল

নির্বিশেষে মানবজাতি। সুতরাং এই অপরাধের কোন ক্ষমা নেই।

এই একই অপরাধে অপরাধী হয়েছিলেন ওহ্‌ম-এর সূত্রের প্রকৃত আবিষ্কারক।

ওহ্‌ম-এর সূত্র তোমরা জানো। তবু আর একবার সেটা মনে করিয়ে দিই। ভৌত অবস্থার পরিবর্তন না হলে, কোন তাড়িৎ বর্তনীতে যে কোন দুটো বিন্দুর মধ্যে যে তড়িৎ প্রবাহ হয় সেটা সেই বিন্দুর বিভব প্রভেদের সমানুপাতিক ও সেই দুই বিন্দুর মধ্যে যে তড়িৎ পরিবাহী, তার রোধের ব্যস্তানুপাতিক। নিচের ছবি দেখলে সূত্রটা আরও পরিষ্কার হবে ঃ

অতএব, A বিন্দু ও B বিন্দুর মধ্যে বিভব প্রভেদ $= V_a - V_b$

এবং তড়িৎ প্রভাব $= I \propto \frac{V_a - V_b}{R}$

সমানুপাতের ধ্রুবকটি একক হওয়ায় ওহ্‌ম-এর সূত্রের পরিণত রূপ হলো, $I = \frac{V}{R}$, যেখানে $V = V_a - V_b$

জার্মান বিজ্ঞানী জি. এস. ওহ্‌ম বিভিন্ন চেহারা ও মাপের পরিবাহী নিয়ে তাদের মধ্যে দিয়ে তড়িৎপ্রবাহ পাঠিয়ে সেই প্রবাহ মেপে দেখেন, এবং এ জাতীয় বহু পরীক্ষার পর 1827 সালে তাঁর বিখ্যাত সূত্রটি আবিষ্কার করে পৃথিবীবাসীকে জানিয়ে দেন।

এই সূত্রের যিনি প্রকৃত আবিষ্কারক, তিনি কিন্তু ওহ্‌ম-এর প্রায় পঞ্চাশ বছর আগেই এই সূত্র অনুমান

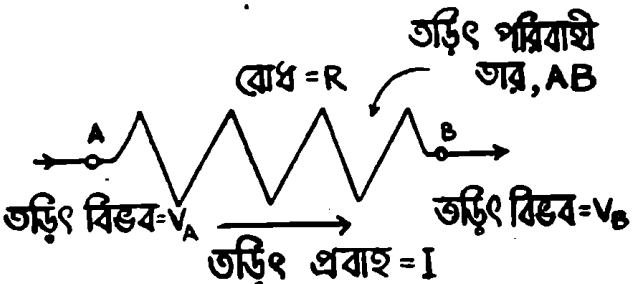

করতে পেরেছিলেন। তাঁর সময়ে তড়িৎ প্রবাহ মাপার তেমন যন্ত্র তৈরি হয়নি। তিনি নিজেও সেরকম কোন যন্ত্র আবিষ্কার করতে পারেন নি। ফলে এই বিজ্ঞান সাধক তড়িৎ প্রবাহ মাপতে খুব প্রাচীন ও যন্ত্রণাদায়ক পথ বেছে নিয়েছিলেন। বিভিন্ন ধরনের পরিবাহীতে বিভিন্ন মানের প্রবাহ পাঠিয়ে তিনি পরিবাহীগুলো আঙুল ছুঁয়ে তড়িৎস্পৃষ্ট হতেন, তারপর যন্ত্রণার তীব্রতা আঁচ করে তড়িৎ প্রবাহের মাপ আঁচ করতেন। এই বিচিত্র পথে পরীক্ষা করেই তিনি ওহ্‌ম-এর সূত্র বের করে ফেলেছিলেন ; কিন্তু তা কখনও প্রকাশ করেন নি। সময়টা তখন ছিলো 1770 সাল।

এই বিজ্ঞানীকে সত্যিকারের প্রতিভাধর অথচ পাগল বিজ্ঞানী বলা যায়। খুব প্রয়োজন না হলে তিনি কারো সঙ্গে কথাই বলতেন না। তাঁর বাড়ির পরিচারিকাদের সঙ্গে তাঁর কোন রকম বাক্যালাপ হতো না। তাদের কিছু বলার দরকার হলে তিনি ছোট ছোট চিঠির সাহায্য নিতেন। আর ভুলক্রমেও কোন পরিচারিকা যদি তাঁর মুখোমুখি হয়ে পড়তো, তাহলে তক্ষুনি তার চাকরি যেতো। এসব কারণেই বাড়িতে সম্পূর্ণ আলাদা একটি দরজা তিনি তৈরি করিয়েছিলেন নিজের নির্বিঘ্ন যাতায়াতের জন্য।

সারাটা জীবন তিনি একা একা বিজ্ঞানের চর্চা করে গেছেন, এবং পৃথিবীর মানুষের কাছে সে সবের প্রায় কিছুই প্রকাশ করেন নি। 1870 সাল নাগাদ বিজ্ঞানী জেমস ক্লর্ক ম্যাক্সওয়েল এই সব অপ্রকাশিত গবেষণার সন্ধান পেয়ে সেগুলো প্রকাশের ব্যবস্থা করেন।

তবে মহাকর্ষ ধ্রুবক আবিষ্কারের ঘটনায় এই বিজ্ঞানীর নাম অমর হয়ে আছে। তিনিই প্রথম নিউটনের সূত্রের সাহায্যে মহাকর্ষ-ধ্রুবক আবিষ্কার করেন, তারপর হিসেব করে বের করেন পৃথিবীর ওজন ও ঘনত্ব। এই পরীক্ষাটি বিজ্ঞানের ইতিহাসে যে একটি অবিস্মরণীয় পরীক্ষা তাতে কোন সন্দেহ নেই।

এবং এই অবিস্মরণীয় বিজ্ঞানীর নাম হেনরী ক্যাভেণ্ডিশ।

ক্যালিডোস্কোপের নকশা

ক্যালিডোস্কোপ তোমরা নিশ্চয়ই দেখেছো। সরু একটা নলের ভেতর এক প্রান্তে আয়না ঘেরা জায়গায় কিছু রঙিন কাচের টুকরো রাখা থাকে। নলের অন্য দিকে চোখ রেখে নলটা আস্তে আস্তে ঘোরালেই রঙিন কাচের টুকরোগুলো চারদিকের ছোট ছোট আয়নায় প্রতিফলিত হয়ে নতুন নতুন সুষম নক্সা তৈরি করে। কখনো কি ভেবে দেখেছো, এভাবে কতগুলো নতুন নকশা তৈরি করা সম্ভব? যদি কোন ক্যালিডোস্কোপে মোট পনেরোটা রঙিন কাচের টুকরো থাকে, আর এক একটা নকশা তৈরি করতে তোমার যদি পাঁচ সেকেণ্ড করে সময় লাগে তাহলে সবগুলো নকশা তৈরি করে দেখতে তোমার কতক্ষণ সময় লাগবে জানো? মোটামুটিভাবে দু'লক্ষ সাত হাজার তিনশো তিরিশ বছর! আর ক্যালিডোস্কোপে মোট তৈরি হবে

আনুমানিক একলক্ষ তিরিশ হাজার সাতশো সাতষট্টি কোটি নতুন নতুন নকশা।

যেহেতু কাচের টুকরোর সংখ্যা পনেরো, সেহেতু তা দিয়ে কতগুলো নতুন নকশা তৈরি করা সম্ভব তার সংখ্যা নির্ণয় করতে হবে। বিন্যাস (PERMUTATION) পদ্ধতিতে অর্থাৎ, সংখ্যা হলো $^{15}P_{15}$ বা ক্রমগুণিত পনেরো (FACTORIAL FIFTEEN)। এক থেকে পনেরো পর্যন্ত সংখ্যাগুলোকে পরপর গুণ করলেই $^{15}P_{15}$ এর মান পাওয়া যাবে।

সুতরাং তুমি যদি এক জীবনে আশি বছর বাঁচো, তাহলে সমস্ত নকশা দেখতে তোমার দুহাজার পাঁচশো একানব্বইটা জীবন লেগে যাবে।

ক্যালিডোস্কোপ প্রথম আবিষ্কার হয় ইংল্যাণ্ডে 1816 সালে; আবিষ্কার করেন স্যার ডেভিড ব্রুস্টার। তারপর দু-এক বছরের মধ্যেই নিজের গুণ দেখিয়ে জিনিসটা মানুষের মন জয় করে নেয়। শোনা যায়, সেই সময়ে এক ফরাসী ভদ্রলোক প্রায় চল্লিশ হাজার টাকায় একটি ক্যালিডোস্কোপ তৈরি করতে দিয়েছিলেন—যার ভেতরে রঙিন কাচের বদলে ছিলো নানান রঙের মণিমুক্তো হীরে জহরত।

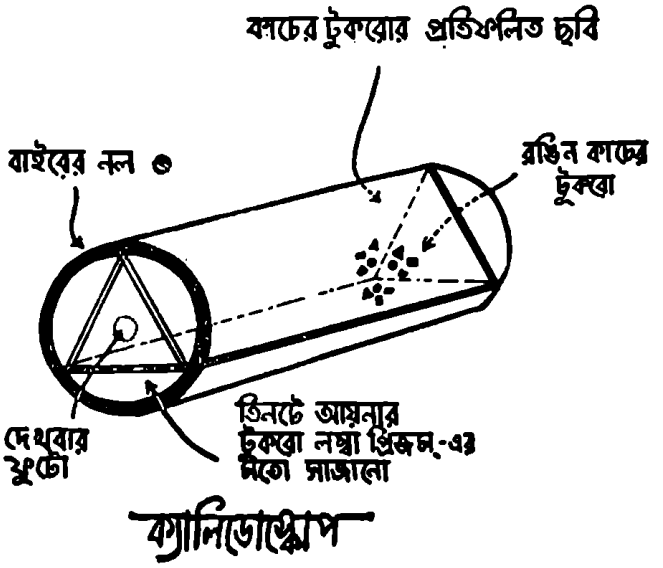

ক্যালিডোস্কোপ

অনেক সময় ক্যালিডোস্কোপের নকশার ছবি তুলে তার নকলে গয়নাগাটির নকশাও তৈরী করা হয়।

৩/৪ গৌরীবাড়ী লেন, কলকাতা-৪

ছবির মজা

স্থিতি-জাড্য

উজ্জ্বল ধর

ধারাবাহিক উপন্যাস

শার্লক হোমস প্রফেসর চ্যালেঞ্জার এবং মঙ্গলগ্রহ

অদ্রীশ বর্ধন

আগে যা ঘটেছে

অদ্ভুত দর্শন একটা কৃস্ট্যালের ভেতর মঙ্গল গ্রহের আশ্চর্য সব দৃশ্য দেখতে পেয়েছিলেন শার্লক হোমস্ ও এডোয়ার্ড চ্যালেঞ্জার। সেই থেকেই সব ঘটনার শুরু। কৃস্ট্যালের ভেতর দিয়ে সেইসব আশ্চর্য প্রাণীরা উড়ে এসে পৃথিবীতে এসে পড়ল। বিরাট চোঙার মতো চেহারা—তিন পায়ে হাঁটছে।

বৈদেশিক দপ্তর ও সরকারী তরফের অনুরোধ—দেশের এই ভয়াবহ বিপদের সময় হোমস্‌কেই দায়িত্ব নিতে হবে মঙ্গলগ্রহীদের সঙ্গে মোকাবিলার।

মিসেস হাডসন কে গ্রামের বাড়ীতে পৌঁছে দিয়ে লণ্ডনে ফিরে এসেছেন শার্লক হোমস্। লণ্ডন শহর এখন জনশূন্য। শুধু শোঁ-শোঁ সাইরেনের আওয়াজ—আর মঙ্গলের দানব তাণ্ডবলীলা। হঠাৎই দেখা হয়ে গেল লণ্ডনের পথে আতঙ্কিত ইন্‌সপেক্টর হপকিন্সের সঙ্গে। হোমসের হাতে সময় নেই। কারণ জরুরী তথ্য পাওয়া গেছে মঙ্গল-গ্রহীদের আচরণে। লাল ফুলগুলো মরে বাদামী হয়ে যাচ্ছে দেখেই সন্দেহ হয়েছিল হোমসের। তবে কি সত্যিই পৃথিবীকে বাঁচানো সম্ভব?

এদিকে বেশ কিছুদিন নিখোঁজ প্রফেসর চ্যালেঞ্জার হঠাৎ ঘরে ঢুকলেন ঝড়ের বেগে। হাতে একদম সময় নেই। জেসিকে নিরাপদে পৌঁছে দিতে হবে প্যারীতে। তারপর তিনি ধাতব দানবের সংগে সরাসরি মোকাবিলায় নামবেন। জাহাজঘাটায় পৌঁছে দেখলেন—অসম্ভব ব্যাপার। গোটা লণ্ডন শহর যেন জাহাজে এসে আশ্রয় নিয়েছে। কোনমতে জেসিকে জাহাজে তুলে দিয়ে চ্যালেঞ্জার রয়ে গেলেন। আর সেই সময়েই শুরু হল মঙ্গলগ্রহীদের নীল বিদ্যুৎ বর্ষণ।

ওয়াটসনের কথা ভেবে হোমস্ চিন্তিত। এডোয়ার্ড চ্যালেঞ্জারই বা কোথায় নিখোঁজ হলেন? পৃথিবীকে কি তিনি মঙ্গলগ্রহীদের হাত থেকে বাঁচাতে পারবেন?

অগণিত মড়ার দিকে তাকিয়ে রাত কাটিয়ে দিলেন প্রফেসর। ঘুমোলেন ভোরের দিকে। তারপর পায়ে হেঁটে রওনা হলেন লণ্ডনের দিকে। পথের কষ্টকে গ্রাহ্য করলেন না। খাবার ফুরিয়ে গেলে দোকান ভেঙে লুঠ করতে দ্বিধা করলেন না। রাতেই হাঁটলেন বেশী—দিনে লুকিয়ে রইলেন ঝোপেঝাড়ে। এইভাবে পৌঁছোলেন লণ্ডনের উপকণ্ঠে। লণ্ডনের দিকে তখন কেউ যাচ্ছে না। লণ্ডন নাকি পুরোপুরি মঙ্গলগ্রহীদের পাল্লায়। চ্যালেঞ্জার এক কান দিয়ে শুনলেন—আর এক কান দিয়ে বার করে দিলেন। রাত গভীর হতেই অন্ধকারে গা ঢেকে ঢুকলেন শহরে। এপথ সেপথ পরিক্রমা করার সময়ে চাঁদের আলোয় নালার মধ্যে অদ্ভুত রকমের লাল ফুল দেখে অবাক হলেন। মঙ্গলগ্রহীরা এর মধ্যেই বাগান সাজাতে আরম্ভ করে দিয়েছে দেখে এত কষ্টেও একটু হাসলেন। তারপর এক সময়ে এনমোর পার্কে নিজের বাড়ীর দোরগোড়ায় পৌঁছোলেন। বাড়ী অটুট। দরজা বন্ধ। পকেট থেকে চাবি বার করে দরজায় যেই লাগিয়েছেন, অমনি চাঁদের আলোয় ছায়া পড়ল দরজার ওপর।

সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে দাঁড়ালেন প্রফেসর। অদূরে দাঁড়িয়ে একটা ধাতবদানব।

চক্ষের পলকে দরজা খুলেই ভেতরে ঢুকে গেলেন প্রফেসর। যেতে যেতেই শুনলেন ঝন্ ঝন্ ঝনাৎ ঝনাৎ শব্দ দ্রুত এগিয়ে আসছে এই দিকে। এক্সপ্রেস ট্রেনের স্পীডে ছুটে এসে তিনটে ঠ্যাং ভেঙে বয়লার দেহটা প্রায় দরজার সামনে নিয়ে এল দানবটা—সেই সঙ্গে ধাতুর শুঁড়ের ঝাপটায় কাচের সার্সি ভেঙে শুঁড় গলিয়ে দিল ভেতরে।

কিন্তু গরিলার মত বপু নিয়েও প্রফেসর চ্যালেঞ্জার যে হরিণের মত ক্ষিপ্র হতে পারেন, সে প্রমাণ তিনি দিলেন সেদিন। ধাতুর শুঁড়ের অবিশ্বাস্য ক্ষিপ্রতাকে হার মানিয়ে তিনি সাঁৎ করে হলঘরের পেছনের দরজা দিয়ে পৌঁছোলেন পেছনের উঠোনে—সেখান থেকে রান্নাঘরের দরজা দিয়ে পাশের গলিতে। কোণ থেকে উঁকি মেরে দেখলেন দানবটা শুঁড় বাড়িয়ে তখনও ভেতর হাতড়াচ্ছে—চুরমার করছে জিনিসপত্র। কাজেই বাড়ীটাকে এই উৎপাতের হাত থেকে রক্ষে করার জন্যে তিনি একটা দুর্বুদ্ধির শরণ নিলেন। রাস্তা থেকে একটা ঢিল কুড়িয়ে নিয়ে মেটাল মনস্টারকে লক্ষ্য করে ছুঁড়ে মারলেন। ঠন্ করে বয়লার বপুতে লেগে ঢিলটা ঠিকরে যেতেই সপাৎ করে একটা শুঁড় আছড়ে পড়ল তাঁর দিকে—সেই সঙ্গে ঘুরে গেল বয়লার দেহ। গরিলা দেহটা দেখিয়েই প্রফেসর চ্যালেঞ্জার স্রেফ লুকোচুরি খেলে গেলেন ভিন গ্রহীর নিষ্ঠুর আততায়ীর সঙ্গে—ছেলেবেলায় খেলেছিলেন,

দেখলেন এখনও দিব্বি মনে আছে। দুটো বাড়ীর মাঝের গলি দিয়ে বাঁই বাঁই করে দৌড়ে শেষ প্রান্তে পৌঁছে ঘাড় ফিরিয়ে দেখলেন ছেড়ে আসা প্রান্তে কালান্তর যমদূতের মতই ঝন্ ঝনাৎ ঝন্ ঝনাৎ শব্দে আবির্ভূত হয়েছে চলমান যন্ত্র-বাহন। বোঁ করে পাশের বাড়ী ঘুরে পাশের গলি দিয়ে ফের রাস্তায় এসে কামানের গোলার মতই নিজের বাড়ীর সামনে এসে গেলেন বুড়ো খোকা চ্যালেঞ্জার এবং পরক্ষণেই উধাও হলেন বাড়ীর মধ্যে। পুরো ব্যাপারটা এত তাড়াতাড়ি ঘটে গেল যে পাছু-নেওয়া দত্যিটা ঝন্ ঝনাৎ ঝন্ ঝনাৎ শব্দে পাশের বাড়ী চক্কর দিয়ে এসে দেখল দাড়িওলা পৃথিবীর পোকা মানুষটা আর নেই—বেমালুম নিপাত্তা। নিশ্চয় রাস্তা দিয়ে পালিয়েছে—এই মনে করে বায়ুবেগে ছুটে গেল রাস্তার এ মোড় থেকে ও মোড়ে, ও মোড় থেকে এ মোড়। কিন্তু ভোঁ ভাঁ। দাড়িওলা বিটলে পোকাটার আর টিকি দেখা গেল না। রাম ভীতু কোথাকার! স্টীম সাইরেনের তীব্র শব্দে রাস্তা কাঁপিয়ে আকাশ ছোঁওয়া অট্ট হেসেই বোধহয় গজেন্দ্র গমনে উধাও হল সে পাশের রাস্তায়। প্রফেসরও জানলার ফাঁক দিয়ে সেই দৃশ্য দেখেই একচোট হেসে সটান গেলেন রান্নাঘরে অনেকদিন পরে ভালমন্দ কিছু খাওয়ার অভিলাষ নিয়ে।

খেয়ে দেয়ে সুস্থ হয়ে স্নান করতে ঢুকলেন। কলে তখনো জল ছিল। সাবান মেখে স্নান করে এসে বসলেন পড়ার ঘরে। দেওয়ালের একটা ছবি সরিয়ে ভেতরকার খুপরি থেকে বার করলেন কৃস্ট্যালটা। স্ত্রীকে নিয়ে অ্যাডভেণ্টারে বেরোনোর সময়ে ইচ্ছে করেই অমূল্য এই বস্তুটি তিনি সঙ্গে নেননি।

এখন সেই অমূল্য নিধিই বার করে ফের বসলেন টেবিলে। মাথায় কালো কাপড় ঢাকা দিয়ে দৃকপাত করতেই দেখতে পেলেন বিস্তর চকচকে রড আর মেশিন নিয়ে অনেকগুলো বিকটদেহী মঙ্গলগ্রহী জোড়াতালা লাগাচ্ছে বিরাট বড় একটা গর্তের মধ্যে—ওকিং-য়ে যে-গর্ত দেখে-ছিলেন, তার দশগুণ বড় তো বটেই। হতচ্ছাড়ারা নতুন নতুন মেশিন বানাচ্ছে। দশটা সিলিণ্ডার তো এসেই গেছে। পঞ্চাশ থেকে ষাটটা বিকটাবতারও এসেছে পৃথিবী জয়ের স্বপ্নে মশগুল হয়ে। অফুরন্ত খাদ্য যে এখানে। ভাবতে না ভাবতেই কৃস্ট্যালের বুকে ফুটে উঠল সেই ভয়ানক দৃশ্য। সম্পূর্ণ নগ্ন একটা লোককে টেনে এনে ফেলা হল যন্ত্রপাতির গাদার মধ্যে। কতকগুলো শুঁড় চেপে ধরল তাকে মেঝের ওপর। আর একটা শুঁড় একটা নল তুলে ধরল বুকের কাছে...

কাপড় চাপা দিয়ে কৃস্ট্যালকে দেওয়ালের খুপরিতে চালান করলেন প্রফেসর। এ দৃশ্য দেখা যায় না। অসহ্য! অসহ্য! অসহ্য! এই কারণেই ভেড়ার পালের মত মানুষগুলোকে তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল সমুদ্রের তীরে। এই কারণেই পিঠের খাঁচায় মুরগী বওয়ার মত নিয়ে যাওয়া হয় মানুষদের—ক্ষিদে পেলেই টাটকা রক্তপানের উদ্দেশ্যে।

সারা শরীর বিবমিষায় শিউরে উঠে প্রফেসরের। জ্ঞানে বিজ্ঞানে শৌর্যে বীর্যে সমুন্নত মানুষের এই শিক্ষাটুকুর দরকার ছিল বোধহয়—দর্পচূর্ণ হচ্ছে কিন্তু বড় শোচনীয় ভাবে...বড় শোচনীয় ভাবে!

গুম হয়ে বসে রইলেন প্রফেসর চ্যালেঞ্জার।

রাত ভোর হতেই ছাদে গিয়ে দেখলেন চারপাশ। পরিষ্কার আকাশ। বাতাসে ধোঁয়া নেই। স্টীমসাইরেনের সংকেত শোনা গেল দিকে দিকে। লণ্ডন করায়ত্ত—এ বুঝি তারই বিজয়োল্লাস।

নেমে এলেন প্রফেসর। শুকনো মাংস আর রুটি দিয়ে ব্রেকফাস্ট খেলেন। জল গরম করে চা করলেন। তারপর বেরোলেন রাস্তায় টহল দিতে। শত্রুর নজর বাঁচিয়ে পথ পরিক্রমা চালিয়ে যাওয়া চাট্টিখানি কথা নয়। কিন্তু চ্যালেঞ্জার যে এ বিদ্যাতেও পটু, তার প্রমাণ দিলেন রাস্তায় বেরিয়ে। হানা দিলেন বেকার স্ট্রীটে—শার্লক হোমের দেখা পেলেন না। ফিরে এলেন গজ গজ করতে করতে। তৃতীয় দিন রাত্রে সহসা রাস্তাঘাট ঝলমল করে উঠল বিদ্যুৎ বাতিতে। এ কী কাণ্ড! এতো নীল আলো নয়, সবুজ আলোও নয়। এ যে ঝকঝকে সাদা আলো! তবে কী মঙ্গলগ্রহীরা বিদায় নিয়েছে? লণ্ডন বিভীষিকা মুক্ত হয়েছে? বিমূঢ় হয়ে পথে বেরিয়ে এলেন চ্যালেঞ্জার। দেখলেন, তিনি একা নন, ভোজবাজীর মত বহু লণ্ডনবাসীও বেরিয়ে এসেছে রাস্তায়। আনন্দে তারা হাত ধরাধরি করে নাচছে, গাইছে, হাসছে।

সহসা হাসি রূপান্তরিত হল কান্নায়। পতঙ্গকে আলো দেখিয়েই টেনে আনতে হয়। ভিনগ্রহীরাও তাই করেছে। গর্ত থেকে পোকার মতই মানুষদের টেনে নামিয়েছে রাস্তায়। পরমুহূর্তেই দলে দলে তারা হানা দিল রাস্তায় রাস্তায়। চ্যালেঞ্জারের চোখের সামনেই একটা ত্রিপদ দৈত্য শুঁড় বুলিয়ে এক একবারে তিন চারজনকে ধরে পুরতে লাগল খাঁচায়। শ'খানেক মানুষ তোলা হয়ে গেল কয়েক মিনিটের মধ্যে!

পালিয়ে এলেন প্রফেসর! সত্যিই পালিয়ে এলেন।

ক্রমশঃ

অজানা মহাকাশে

অভিনব তাস খেলা

দীপঙ্কর বসু

কয়েকদিন আগের কথা। দুপুরবেলা শুয়ে শুয়ে কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান পড়ছি। শুনতে পেলাম পাশের বাড়ির বৌদির চিৎকার। জানালায় মুখ বাড়িয়ে জিজ্ঞাসা করলাম 'কি বৌদি, কি হল দুপুরবেলা ?'

'আর বল না ভাই, এই রাজাটা সারাদিন কেবল তাস খেলছে, পড়াশুনার নামই নেই।'

রাজা ওনার ছেলের নাম। ক্লাস নাইনে পড়ে।

পরের দিন বাজারের পথে দেখা রাজার সঙ্গে। ডাকলাম, 'এই এদিকে শোন্। পড়াশুনা না কোরে সারাদিন তাস খেলছিস্ নাকি ?'

বলল, 'না, মানে—

বললাম, ফিস্ বা রামি নামের তাস খেলা জানিস্ ?' ও অবাক হয়ে ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানাল। হয়ত মনে মনে ভাবছিল কিরে বাবা, দিপুদা আমাদের সঙ্গে তাস খেলবে নাকি !

আবার জিজ্ঞাসা করলাম, 'ফর্মুলার যোজ্যতা পড়িয়েছে তোদের ?'

ওর তখন অবস্থা এক কথায় শোচনীয়। কোন মতে হ্যাঁ বলল।

বললাম, কিরে, ভাবছিস্ আমি পাগলের মতো কি সব বক্‌ছি। না, পাগলের মতন না, সব কিছু আমি ঠিকই বলছি।' মনে হল একটু ভরসা পেয়েছে। বলল, 'যোজ্যতা মুখস্ত করা আর তা দিয়ে ফর্মুলা তৈরী করতে গেলে মাঝে মাঝে কেমন গুলিয়ে যায়। একটার যোজ্যতা অন্য একটার ঘাড়ে লেগে যায়।' মনে মনে হাসলাম। বললাম, 'এই জন্যই তাস খেলার কথা জিজ্ঞাসা করছিলাম। কাল বাড়িতে তুই তোর বন্ধুদের নিয়ে আসিস্। এমন একটা তাস খেলা শিখিয়ে দেব যাতে তাস খেলার আনন্দ ও বুদ্ধিমত্তাও পাবি আবার যোজ্যতা, ফর্মুলাও সব মনের মধ্যে গেঁথে যাবে।' রাজা আর ওর বন্ধুদের যে খেলাটা শিখিয়ে দিয়েছিলাম তোমাদের কাছেও সেই খেলাটার কথা লিখছি।

প্রথমে দু'সেট তাস নিতে হবে। তার পরে যে দিকটায় টেক্কা, সাহেব ইত্যাদি লেখা বা আঁকা আছে সেদিকে তাসের সাইজে সাদা কাগজ আঠা দিয়ে লাগাতে হবে। আঠা রোদে শুকিয়ে গেলে তার উপর পেনের কালি দিয়ে বা অন্যভাবে বিভিন্ন পরমাণু বা মূলকের সংকেত চিহ্ন ও নাম লিখতে হবে। বাহান্নটি তাসে এমন পরমাণু বা মূলকের সংকেত চিহ্ন লিখতে হবে যেগুলো সাধারণভাবে তোমাদের লাগে। তোমাদের সুবিধার জন্য আমি কি কি পরমাণু বা মূলক নিতে হবে এবং তার যোজ্যতা পাশে লিখে দিচ্ছি। তবে যোজ্যতাটা কিন্তু তাসের উপর লিখবে না।

H (1), hi (1), Be (2), Na (1), K (1), Mg (2), Ca (2), Sr (2), Ba (2), Al (3), V (3,5 ; 2,4) Cu (1,2), Zn (2), Fe (2,3), Co (2,3), Ni(2), Mn (2,3,4) Ti (2,3,4) Ca (2), Hg (1,2) Sn (2,4), Sb (3,5), Bi (2,3) Pb (2), Ag (1), NH4 (1), F,Cl, Br,I (1), Co_3 (2) NCo_3(1), So_4 (2), HSo_4 (1), So_3 (2), Cr_2o_7 (2), Cro_4 (2), No_2 (1), No_3 (1), Po_4 (3), Aso_4 (3), Mno_4 (1), Bo_3 (3), Sio_3 (2), O (2), H (1), $Fe(CN)_6$ (4), OH (1), CN (1), S_2O_3 (2), Zno_2 (4) প্রত্যেকটা পরমাণু বা মূলক একটি তাসে লিখবে। যেমন—সোডিয়াম, টাইটেনিয়াম, কার্বনেট, সালফেট এইভাবে ছাব্বিশটি ইলেকট্রো পজেটিভ

পরমাণু বা মূলক হল ছাব্বিশটি তাস এবং ছাব্বিশটি ইলেকট্রো নেগেটিভ পরমাণু বা মূলকের জন্য ছাব্বিশটি মোট বাহান্নটি তাস তৈরী হল। আর বাকি বাহান্নটি তাসের উপর এক থেকে চার সংখ্যাটি লিখতে হবে। এক লেখা তাসের সংখ্যা হবে সতেরো। এরকমভাবে দুই, তিন লেখা তাসের সংখ্যাও হবে সতেরো। চার লেখা তাসের সংখ্যা হবে এক। তাহলে মোট দু'সেট তাস তৈরী খেলার জন্য। এবার বলছি কি করে খেলতে হবে।

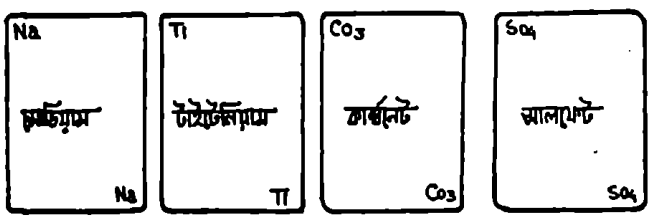

প্রথমে তাসগুলো শাফল্ (Shuffle) দিয়ে নিতে হবে। এবার খেলোয়াড়দের প্রত্যেককে বারোটা করে তাস বেটে দিতে হবে। সাধারণভাবে চারজন মিলে খেললেই ভাল। তবে খেলোয়াড়ের সংখ্যা প্রয়োজন অনুযায়ী দুই থেকে পাঁচ হতে পারে। বাকি তাস মাঝখানে রাখতে হবে। এবার যে তাস দিয়েছে তাঁর ডানদিক থেকে মাঝখানের তাসের উপর থেকে একটা তাস টানতে হবে

এবং তেরোটা তাসের যে কোন একটা তাস ফেলে দিতে হবে। পরের জন ইচ্ছে করলে আগের জনের ফেলে দেওয়া তাসটা নিতে পারে বা মাঝখানের উপরের তাসটাও নিতে পারে। এইভাবে তাস নেওয়া ফেলা চলবে ততক্ষণ যতক্ষণ না কোন একজন বারোটা তাস দিয়ে তিনটে যৌগ তৈরী করতে পারবে। যেমন,

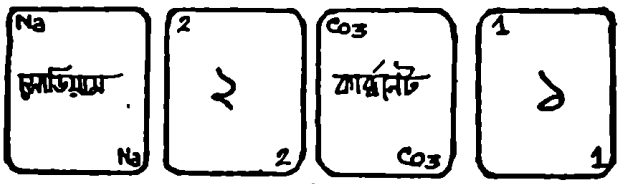

সোডিয়াম কার্বোনেট (Na_2CO_3)

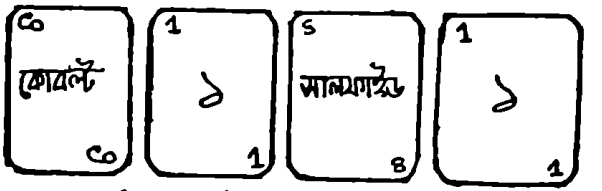

কোবল্ট সালফাইড (Co_3)

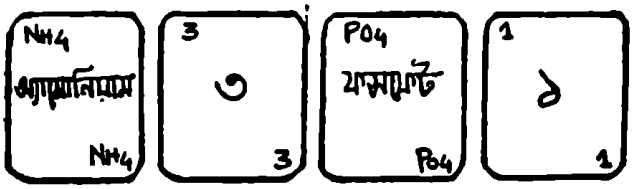

অ্যামোনিয়াম ফসফেট, $(NH_4)_3PO_4$

একজনের তিনটি যৌগ হলে সকলে তাস ফেলে দেবে। মনে করলাম বাকি তিনজনের মধ্যে একজনের দুটি যোগ এবং আরেকজনের একটি যৌগ হয়েছিল। এর মধ্যে প্রথমজনের দুটি যৌগের জন্য আটটি তাস বাদ দিলে বাকি থাকে চারটি তাস এবং দ্বিতীয়জনের একটি যৌগের চারটি তাস বাদ দিলে বাকি থাকে আটটি তাস। তৃতীয় জনের বারোটি তাস। তাহলে প্রত্যেকের পয়েন্টের ঘরে বসবে প্রথমজনের শূন্য, দ্বিতীয়জনের চার, তৃতীয় জনের আট এবং চতুর্থজনের বারো।

এইভাবে সবচেয়ে প্রথম যে একশতে পৌঁছাবে বা একশ ছাড়াবে সে সবচেয়ে নীচু স্থানে এবং ঐ সময় পয়েন্ট যার সবচেয়ে কম থাকবে সে সবচেয়ে উঁচু স্থান পাবে। সময় অনুযায়ী শেষ গণ্ডী তোমরা একশর জায়গায় দুশ, তিনশো পাঁচশো করতে পার। একটা কথা সবসময় মনে রাখতে হবে, যে যৌগ তোমরা বানাবে তা যেন সম্ভাব্য হয় অর্থাৎ ক্যালসিয়ামের যোজ্যতা দুই আর নাইট্রেটের যোজ্যতা এক। যতক্ষণ না ক্যালসিয়ামের তাসের সঙ্গে এক যোজ্যতার তাস এবং নাইট্রেটের সঙ্গে দুই যোজ্যতার তাস লাগাতে পারছ ততক্ষণ কোন যৌগ তৈরী হবে না। ক্যালসিয়াম এবং নাইট্রেট উভয়েরই এক যোজ্যতা নিলে $CaNo_3$ কোন যৌগ তৈরী হবে না। এবার একটা উদাহরণ দেওয়া যাক্। মনে কর, তুমি তাস পেয়েছ এরকম ঃ পটাশিয়াম (K), লিথিয়াম (hi), অ্যালুমিনিয়াম (Al) মার্কারি (Hg), ক্লোরাইড (Cl), ফসফেট (Po_4), অ্যামোনিয়াম (NH_4), সালফেট (So_4) ১(1), ১(1), ৩(3), ২ (2)।

তোমার হাতে সংখ্যার তাস আছে মাত্র চারটি। দুটি ১ (1), একটি ২ (2) এবং একটি ৩ (3)। তুমি এই তাস দিয়ে কোন মতেই দুটোর বেশী যৌগ বানাতে পারবে না। তুমি তখনই তিনটি যৌগ বানাতে পারবে যখন তিনটি ইলেকট্রো পজেটিভ, তিনটি ইলেকট্রো নেগেটিভ এবং ছয়টি সংখ্যার তাস থাকবে। তাই তাস টেনে টেনে তোমায় এরকম সেট্ প্রথমে পেতে হবে। আবার এমনও হতে পারে যে সেটটি ঠিকই পেয়েছ কিন্তু সংখ্যাগুলো এমন পাওনি যাতে তোমার সম্ভাব্য যৌগ হয়। যেমন কোবল্ট (Co) সালফাইড (3) পেলে সংখ্যার তাস পেলে ২ (2) এবং ৩ (3)। এক্ষেত্রে সম্ভাব্য যৌগের জন্য পেতে হবে দুটো ১ (1) সংখ্যা। যদিও কোবল্টের এবং সালফাইডের যোজ্যতা উভয়ের দুই, কিন্তু তোমরা নিশ্চয়ই জান Co_2S_2 এরকম যৌগ লেখবার নিয়ম নেই। কাজেই এরকম করলে চলবে না। এছাড়া আরেকটা নিয়ম আছে। মনে কর তুমি পেলে পটাশিয়াম, ক্যালসিয়াম, অ্যামোনিয়াম, ক্লোরাইড, ফসফেট, সালফেট, ১ (1), ১ (1), ১ (1), ২ (2), ২(2), ৩(3)। এখন তুমি তাসগুলোকে এইভাবে সাজাতে পার— আবার এই সেটকে এইভাবেও সাজাতে পারা যায় ঃ

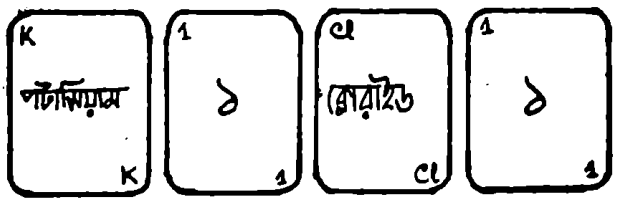

পটাসিয়াম ক্লোরাইড

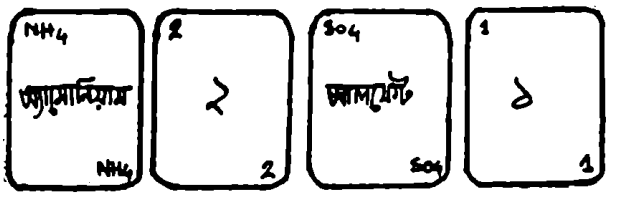

অ্যামোনিয়াম সালফেট

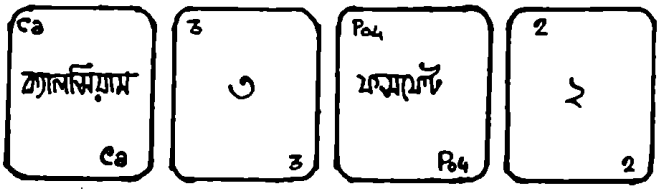

ক্যালসিয়াম ফসফেট, $Ca_3(PO_4)_2$

অন্যভাবে সাজানো

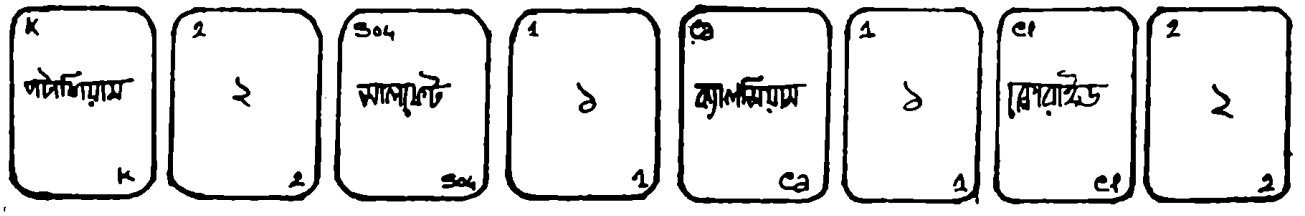

পটাসিয়াম সালফেট (K_2SO_4) ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড ($CaCl_2$)

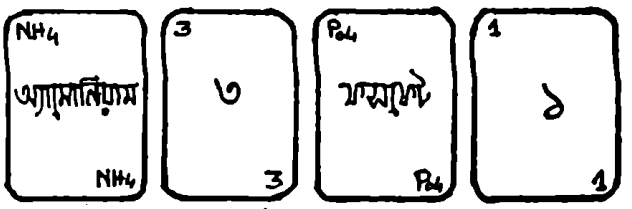

অ্যামোনিয়াম ফসফেট, $(NH_4)_3PO_4$

এইরকম ভাবে বারোটা তাসকে একবারের বেশী যতবার সাজাতে পারবে এক করে পয়েন্ট ততবার বোনাস হিসাবে বাদ যাবে। এর ফলে তোমরা অনেক বেশী সংখ্যায় বিভিন্ন যৌগের সহিত পরিচিত হতে পারবে।

একটা জিনিস বোধ হয় লক্ষ্য করেছ যে সংখ্যা দেওয়া তাসের মধ্যে একটা মাত্র তাসের সংখ্যা 8 (4)। আবার ইলেকট্রো নেগেটিভ $Fe(CN)_6$-এর যোজ্যতাও চার। কাজেই সংখ্যা 8 (4) এর তাস যে পাবে সে ততক্ষণ পর্যন্ত সম্পূর্ণ সেট্ তৈরী করতে পারবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না $Fe(CN)_6$-এর তাসটি পাবে।

কাজেই বুঝতে পারছো তো যে তাস খেলার বা সাধারণ বুদ্ধির এখানে যথেষ্ট প্রয়োজন হবে। আর একটা কথা। উপরে যে মূলকের চার্টটা দিয়েছি সেটা তোমরা পিচ বোর্ডের মধ্যে পাশাপাশি যোজ্যতা সহ লিখে রাখতে পার। প্রত্যেকবার খেলার শেষে মিলিয়ে দেখে নেবে, যে যৌগগুলো বানালে তা সম্ভাব্য কি না।

তাহলে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব খেলা শুরু করে দেও।

8 সরশুনা মেইন রোড, বকুলতলা, কলিঃ-৬১

রহস্যময় শনির বলয়

অমিতাভ সেন

কেন যে লোকের দুর্ভাগ্যের জন্য শনিকে দায়ী করা হয় বলা মুস্কিল। কিন্তু এবার বোধ হয় তার সে দুর্নাম কিছুটা ঘুচল। মানুষের তৈরী মহাকাশ যান ভয়েজার-২ দিব্যি ছবি তুলে পাঠিয়েছে শনির কাছ থেকে।

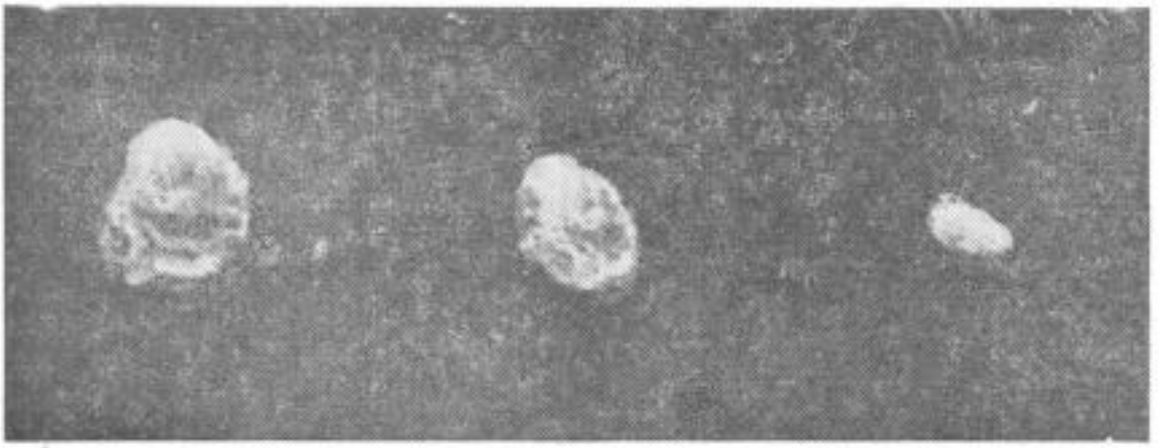

চিত্র—১

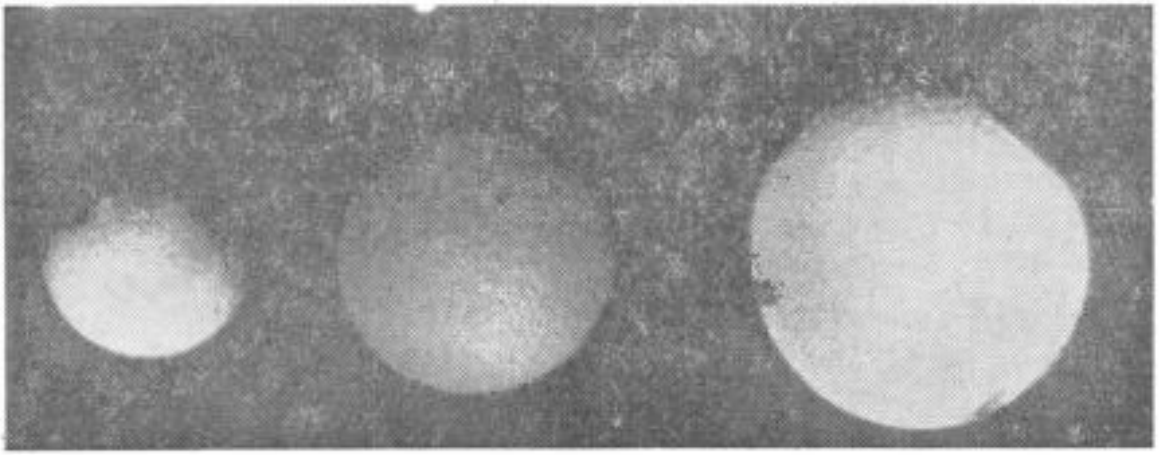

চিত্র—২

...বলয়ের জন্যই প্রসিদ্ধ শনিগ্রহ। কিন্তু ১৬১০ সালের আগে গ্যালিলিও টেলিস্কোপে চোখ না লাগানো অবধি শনির বলয়ের খোঁজ পাওয়া যায়নি। তারপর হিগেন্স্, ক্যাসিনি প্রমুখ জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা শনির বলয় সম্বন্ধে আহরণ করেছেন নিত্য নতুন তথ্য। কিন্তু সে সবই তো অনেক দূরে পৃথিবীতে বসে উন্নত থেকে উন্নততর দূরবীক্ষণ যন্ত্রের মারফৎ যতটুকু সম্ভব বাড়তি খোঁজ খবর নেওয়া।

কাছ থেকে শনির বলয়-রহস্য ভেদ করার দারুণ সুযোগ দিল মহাকাশযান ভয়েজার-১ ১৯৮০-এর নভেম্বরে। আর তারপর একেবারে চমকে দিল ভয়েজার-১ এরই যমজ ভয়েজার-২ ১৯৮১-র আগস্ট মাসে। এই আন্তঃগ্রহ মহাকাশযান দুইটিকে আমেরিকার ফ্লোরিডার কেপ্ কেনেডি থেকে ছাড়া হয় যথাক্রমে ১৯৭৭-এর আগস্ট ও

সেপ্টেম্বর মাসে। আর এদের কাজকর্ম ও চলাফেরার তদারকি বা খবরদারি করতে শুরু করল ক্যালিফোর্নিয়ার প্যাসিডেনাতে অবস্থিত জেট্ প্রোপালশান্ ল্যাবরেটরি।

চার বছর ধরে মহাকাশ পাড়ি দিচ্ছে এই দুটি যান। বৃহস্পতি দর্শন শেষ করে তারা শনিকেও দেখে গেছে। ভয়েজার-২ শনির খুব কাছে এসে পৌঁছয় ১৯৮১-র আগস্টে। একের-পর-এক ফটো তোলা আর পৃথিবীতে

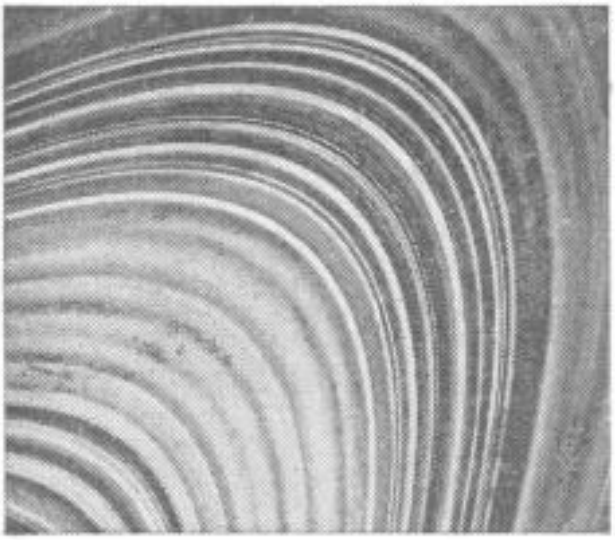

চিত্র—৩

পাঠানো তো আছেই। ভয়েজার-২ শনির পরিমণ্ডল থেকে যে সব ছবি পাঠিয়েছে তা পর্যবেক্ষণ করে সেরা বিজ্ঞানীরাও অবাক হয়েছেন। অনেক তথ্যই জানা গেছে যা অজানা ছিল, অনেক পুরনো ধারণাই প্রমাণিত হয়েছে ভুল।

শনির উপগ্রহগুলির অনেক ছবি তুলেছে ভয়েজার-২। ১৪৭ লক্ষ কিলোমিটার দূর থেকে তোলা ১নং ছবিতে দেখা যাচ্ছে উপগ্রহ এন্‌সিলাডাস-কে (Enceladus) (বাঁ দিকে) আর উপগ্রহ ডাওন (Dione) রয়েছে শনির উত্তর গোলার্ধের ওপরে। এই এন্‌সিলাডাস উপগ্রহটির গায়ে দেখা গেছে প্রচুর গর্ত ও গহ্বর আর সেই সঙ্গে বরফের আবরণ। বিজ্ঞানীদের ধারণা এই বরফ একবার করে জমে আর তার পর আবার গলে।

ভয়েজার-২ এর পাঠানো ফটো থেকে শনির আরেকটি উপগ্রহ আয়াপেটাস সম্বন্ধে জানা গেছে যে ওই উপগ্রহের একটি গোলার্ধ অপর গোলার্ধটির তুলনায় উজ্জ্বল হবার কারণ বোধহয় এইটাই, যে স্বল্পালোকিত গোলার্ধটিতে সম্ভবতঃ বেশি পরিমাণে পিচ বা অ্যাস্‌ফাল্ট জাতীয় বস্তু আছে।

এতদিন সবাই জানত শনির উপগ্রহ টাইহান্-ই সৌরমণ্ডলের সব উপগ্রহের মধ্যে বৃহত্তম। ভয়েজার-২ আমাদের এই ভুল ভাঙিয়ে দিয়েছে। বৃহস্পতির উপগ্রহ গ্যানিমেড-ই সৌরমণ্ডলের বৃহত্তম উপগ্রহ আর টাইহান্ রয়েছে দ্বিতীয় স্থানে। তবে ভয়েজার-২ আমাদের সবচেয়ে চমকে দিয়েছে টাইহানের আবহাওয়ামণ্ডল আবিষ্কার করে। সৌরজগতের উপগ্রহদের মধ্যে একমাত্র টাইহানের-ই আবহাওয়ামণ্ডল আছে। তবে সেই সঙ্গে বিজ্ঞানীরা আবার ভাবনায়ও পড়েছেন। টাইহানের আবহাওয়ামণ্ডল রয়েছে কিন্তু অয়নমণ্ডল নেই কেন? আগে ধারণা ছিল টাইহানের আবহাওয়ার বেশির ভাগটাই মিথেন গ্যাস কিন্তু ভয়েজার-২ আবিষ্কার করেছে এখানে সবচেয়ে বেশি পরিমাণে আছে নাইট্রোজেন। বিজ্ঞানীদের ধারণা এই উপগ্রহে সমুদ্র ও হ্রদও থাকতে পারে। তবে সেখানে জল নেই আছে তরল নাইট্রোজেন। আর তাপমাত্রা? শূন্যের নিচে ১৯০ ডিগ্রি সেল্‌সিয়াস।

শনির আরো দুটি উপগ্রহের ফটো দেখা যাচ্ছে ২নং চিত্রে। ওপরের ছবিটায় রয়েছে উপগ্রহ হাইপারিঅন। মোটামুটি ভাবে দৈর্ঘ্যে ৩৬০ কিলোমিটার আর প্রস্থে ২১০ কিলোমিটার। বিজ্ঞানীদের মতে উপগ্রহটি অভিকর্ষজনিত সাম্যাবস্থায় নেই। কোনো একটি বড়সড় উল্কার আঘাত হয়তো এটিকে তার নিজস্ব কক্ষ পথ থেকে সরিয়ে দিয়েছে। উপগ্রহটির গায়ে বহু উল্কাপাতের চিহ্নও রয়েছে। ২নং চিত্রের নিচে দেখা যাচ্ছে শনির আরেকটি উপগ্রহ টেথিস্-কে। এটির ব্যাস ৪০০ কিলোমিটার।

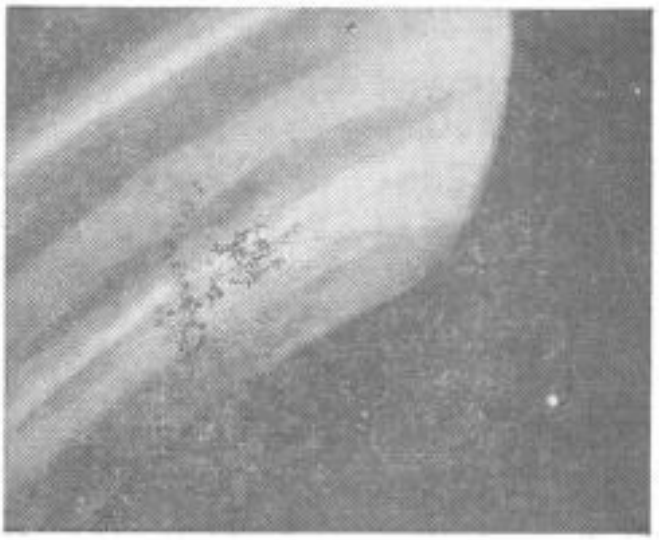

চিত্র—৪

শুধু উপগ্রহের ছবি তুললেই তো হবে না। তাই আরো এগিয়ে এল ভয়েজার-২। ২৭ লক্ষ কিলোমিটার দূর থেকে তোলা ৫নং চিত্রটিতে দেখা যাচ্ছে শনির সি-বলয় ও বি-বলয়ের ছবি (৩নং চিত্রের ওপরে বাঁ দিকে)। বিজ্ঞানীরা এই ছবিটি পরীক্ষা করে ৬০টিরও বেশি উপবলয়ের সন্ধান পেয়েছেন যার কোনটি উজ্জ্বল ও কোনটি নিষ্প্রভ। বিভিন্ন উপবলয়ে বিভিন্ন পদার্থের উপস্থিতিই উজ্জ্বলতার এই হেরফের হবার কারণ বলে মনে করা হচ্ছে।

এতদিন ধারণা ছিল শনির বলয় বোধহয় একটি কিন্তু ভয়েজার-২ এর ছবি পরীক্ষা করে জানা গেছে—ছোটবড় মিলিয়ে শনির বলয়ের সংখ্যা এক লক্ষেরও বেশি। বরফ ও ধুলোকণায় তৈরী এইসব বলয়ের মধ্যে অন্য নানারকম পদার্থেরও হদিশ পাওয়া গেছে।

ভয়েজার-১ এর পাঠানো ফটোতে বিজ্ঞানীরা একটি ৫০০ কিলোমিটার চওড়া শনির বলয় দেখতে পেয়েছিলেন। বলয়টি আসলে বিনুনীর মতো বাঁধা তিনটি বলয়ের সমষ্টি। বলয়টির নামকরণ হয়েছিল 'এফ্-বলয়'। এখন ভয়েজার-২ এর ছবি থেকে বোঝা যাচ্ছে তিন নয়, চোদ্দটি বলয় রয়েছে 'এফ্ বলয়'-এর মধ্যেই। এফ বলয়ের ভেতরকার ক্ষুদে বলয়গুলো সব সময় যেন কাঁপছে বলে মনে হয়। বিজ্ঞানীদের অনুমান বলয়টির মধ্যকার বস্তুকণাদের সঙ্গে শনির চৌম্বক ক্ষেত্রের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার দরুনই এই ঘটনা ঘটছে।

শনির ছবি তুলেই ক্ষান্ত হয়নি কিন্তু ভয়েজার ভাইয়েরা। ভয়েজার-২ তার যাত্রাপথে শনির ওপরকার মেঘজমা অঞ্চলের মাত্র ১০১,০০০ কিলোমিটার দূর দিয়ে ও শনির বলয়গুলির মধ্যে একটি ফাঁক্ গলে এখন মহা আনন্দে এগিয়ে চলেছে। ১৯৮৬ সালে ভয়েজার-২কে যে তার অ্যাপয়েন্টমেন্ট রক্ষা করতে হবে ইউরেনাস্ গ্রহের সঙ্গে। তারপর আবার ১৯৮৯-তে তার দেখা করার কথা নেপচুন্ গ্রহের সঙ্গে।

থিং চিয়ার্স ফর্ ভয়েজার-২ !

৮/১এ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলি-৭৩

বিজ্ঞান ক্লাব পরিচিতি

সূর্যের আলোয় রান্না

কিন্নর রায়

কয়লা-ঘুঁটে, ধোঁয়া-গ্যাস ছাড়া রান্নাবান্না ভাবাই যায় না। এরকম কথা কেউ বললে টলেও মনে হয়, কেউ আলিবাবার গল্প শোনাচ্ছে, বা রূপকথা।

কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ বিভাগের ছাদের ওপর সূর্যের আলোয় সৌর উনোন জ্বলেছে, লংপ্লেয়িং রেকর্ড বেজেছে। ৩০ নভেম্বর থেকে ১২ ডিসেম্বর কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় ও সোলার এনার্জি সোসাইটি ব্যাপারটার আয়োজন করেছিলো সোলার এনার্জি ক্যাম্প্ উপলক্ষে।

ইলেকট্রনিকস কর্পোরেশন অফ ইণ্ডিয়া লিমিটেডের তৈরী এ্যালুমিনিয়াম বোর্ডের প্যানেলে সিলিকন সেলের ওপর সূর্যের আলো পড়ে লং প্লেয়িং রেকর্ড বেজেছে। তৈরী করতে খরচ হয়েছে হাজার দেড়েক টাকা।

সৌর উনোনের ব্যাপারটাও খুব মজার। প্রায় হারমোনিয়ামের মতো দেখতে গাঢ় কালো রঙের একটি বাক্সের ঢাকনার ওপর আয়না লাগানো আছে। আয়নার মুখ সূর্যের দিকে। সূর্যের আলো আয়নায় প্রতিফলিত হয়ে বাক্সের মধ্যে আরও জোরালো হয়ে আসে। বাক্সের মধ্যে বসানো পায়েস বা ভাত তৈরীর বাটি। দিব্যি আলোর আঁচে ভাত ও পায়েস তৈরী হয়ে গেল।

প্রদর্শনীতে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছিল তাদের বিজ্ঞান ক্লাব ও গোবরডাঙা রেনেশাঁ ইনস্টিটিউটের সদস্যগণ।

জীবনবিজ্ঞানের প্রথম পাঠ

পর্যবেক্ষণ শিক্ষা

তারক মোহন দাস

শান্তিনিকেতনে জগদানন্দ রায় যখন বিজ্ঞান পড়াতেন তখন তিনি ছেলেদের যে বিষয়টি খুব যত্নের সঙ্গে হাতে-কলমে শেখাতেন তা হল দেখতে শেখা, কি করে একটি বস্তু বা জীবকে খুঁটিয়ে দেখতে হয়। একজন তরুণ বিজ্ঞানী ও আবিষ্কারকের যে গুণটি সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন তা হল নিখুঁতভাবে পর্যবেক্ষণ করবার ক্ষমতা। এটি প্রকৃতিদত্ত সহজাত ক্ষমতা, এরই ওপর নির্ভর ক'রে পৃথিবীর অধিকাংশ প্রাণী সুষ্ঠুভাবে জীবনধারণ করে থাকে। সাধারণ মানুষের জীবনেও তাই এই ক্ষমতার প্রয়োজন ও ব্যবহার অপরিহার্য। বিজ্ঞান মানসিকতা সৃষ্টিতেও এটি সাহায্য করে।

বিগত কয়েকটি সংখ্যায় আমরা জেনেছি সঠিক ভাবে পর্যবেক্ষণ করা হল বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির প্রথম ধাপ এবং চেষ্টা করলে অনুশীলনের সাহায্যে আমাদের এই সহজাত ক্ষমতা অসাধারণ পর্যায়ে উন্নত করা যায়। এখানে কয়েকটি সহজ অনুশীলনের বিবরণ দেওয়া হল ; আমাদের পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের পর্যবেক্ষণ করবার ক্ষমতা উন্নত করতে হলে এগুলি নির্দিষ্টভাবে অনুশীলন করতে হবে।

দৃষ্টিশক্তি

আমরা যখন কোন বস্তু দূর থেকে দেখি তখন বস্তুটি সম্পর্কে মনে মনে পাঁচটি তথ্য সংগ্রহ করি, যেমন—(১) বস্তুটির সংখ্যা, (২) বস্তুটির আয়তন বা পরিমাণ, (৩) বস্তুটির দূরত্ব, (৪) বস্তুটির রং, (৫) বস্তুটির গঠন বৈশিষ্ট্য।

সংখ্যার অনুশীলন—আকাশে একটি, দুটি বা তিনটি পাখি উড়তে দেখলে খুব সহজেই তাদের সংখ্যা নির্ণয় করা যায়। কিন্তু একসঙ্গে দশ-বারোটি পাখি থাকলে তাদের সংখ্যা নির্ণয় করা কঠিন। কিন্তু বারংবার চেষ্টা করলে এই ক্ষমতা ধীরে ধীরে আমাদের আয়ত্তের মধ্যে আসে, তখন দূর থেকে এক ঝাঁক পাখি দেখলেও বলে দিতে পারা যায় তাদের মোটামুটি সংখ্যা কত। সংখ্যা সম্পর্কে মানুষের একটা স্বাভাবিক ভীতি আছে। আমরা রোজ দেখলেও জানি না টগর ফুলের পাপড়ির সংখ্যা কত—পাঁচ না ছয় ; রঙ্গন ফুলের পাপড়ির সংখ্যা কত—চার না পাঁচ। একটা নারিকেল গাছের মাথায় কটা পাতা থাকে, জীবনে কোনদিনই তা গুণে দেখি না। পাখির পায়ে কটা নল থাকে, তাও কোনদিন গুণে দেখি না। একজন প্রথম শ্রেণীর পর্যবেক্ষক হতে হলে কোন জিনিস দেখা মাত্রই তার সংখ্যা কত এবং তার বিভিন্ন অংশের সঠিক সংখ্যা কত তা জানবার এবং মনে রাখবার চেষ্টা করবে। একসঙ্গে কতকগুলি জিনিস দেখলে তাদের সংখ্যা সম্পর্কে একটা মোটামুটি ধারণা করা কিন্তু খুব শক্ত নয়। নারিকেল গাছ থেকেই শুরু করা যেতে পারে ঃ

দূর থেকে একটা নারিকেল গাছ দেখ, তার পাতার সংখ্যা অনুমান কর, সেটা কাগজে লিখে রাখ, তারপর গুণে দেখ সঠিক সংখ্যাটি কত। তোমার অনুমান কতদূর নির্ভুল হয়েছে ? পরপর দশটি গাছ নিয়ে পরীক্ষা কর। এরপর তালগাছ ও সুপারিগাছের পাতার সংখ্যা, আকাশে পাখির ঝাঁকে পাখির সংখ্যা, ভিড়ের মধ্যে মানুষের সংখ্যা, ফুলের থোকায় ফুলের সংখ্যা, ফুলের পাপড়ির সংখ্যা নিয়ে অনুমান কর, তারপর সঠিক সংখ্যাটি গণনা করে দেখ। এইভাবে অনুশীলন করলে সংখ্যা অনুমান করবার ক্ষমতা ক্রমশঃ নির্ভুল হয়ে উঠবে।

আয়তনের অনুশীলন—চোখে দেখে আমরা কোন বস্তুর সাইজ বা আয়তন সম্পর্কে একটা ধারণা করে থাকি। কিন্তু এই ধারণা অনেকেরই নির্ভুল হয় না, প্রকৃত মাপের সঙ্গে অনেক পার্থক্য থাকে। কিন্তু চেষ্টা করলে এই পার্থক্য অনেক কমিয়ে আনা যায়। বার বার অনুশীলন করলে মানুষের চোখের দৃষ্টিও ফিতার মাপের মত নির্ভুল হয়ে ওঠে।

ক্লাশঘরের মধ্যে বসে ভাল করে লক্ষ্য কর দরজা, টেবিল ও বেঞ্চগুলি, তারপর অনুমান কর এবং খাতায় লিখে রাখ দরজার প্রস্থ ও উচ্চতা, জানলার প্রস্থ ও উচ্চতা ; টেবিল ও বেঞ্চের দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতা ; যে ঘরে বসে আছ সেই ঘরের দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতা। তারপর একটি ফিতার সাহায্যে ঐগুলির সঠিক মাপ নাও এবং মিলিয়ে দেখ তোমার অনুমান কতদূর নির্ভুল হল। বাগানের মধ্যে গিয়ে নানা রকম চারাগাছ লক্ষ্য কর এবং অনুমানের ওপর নির্ভর করে লেখ তাদের উচ্চতা কত, শাখার দৈর্ঘ্য কত, কাণ্ডের পরিধি কত, পাতা ও ফুলের দৈর্ঘ্য কত। তারপর ফিতার সাহায্যে মেপে দেখ, তোমার অনুমান সঠিক হল কিনা। গরু, ছাগল, ভেড়া, কুকুর, বিড়াল নিয়েও এই অনুশীলন করা যায়।

কিছু শস্য অথবা বালি একটি জায়গায় রেখে তার পরিমাণ অনুমান কর এবং তা লেখ, তারপর সেটি ওজন করে দেখ তোমার অনুমান কতদূর নির্ভুল হল। এই ভাবে বিভিন্ন বালতি ও পাত্রে জল নিয়ে অনুমানের সাহায্যে তার পরিমাণ নির্ণয় কর। তারপর মিলিয়ে দেখ ঐ অনুমান কতদূর নির্ভুল হল। পরীক্ষাগুলি অন্ততঃ দশবার করা দরকার।

দশটি কাগজের টুকরো নাও, অনুমানের ওপর নির্ভর করে প্রত্যেকটি টুকরো সমান দুই ভাগে ভাগ কর কাঁচির সাহায্যে, মিলিয়ে দেখ টুকরো দুটি সমান হল কিনা। এই ভাবে সবু ফালিটি তিন বা পাঁচটি সমান টুকরোতে ভাগ করবার চেষ্টা কর, মিলিয়ে দেখ প্রত্যেকটি টুকরো সমান হচ্ছে কিনা। বারবার অনুশীলন করলে এই ক্ষমতা ক্রমশঃ বাড়বে।

দূরত্বের অনুশীলন—একটি বস্তু বা একটি বৃক্ষ তোমার কাছ থেকে কত দূরে আছে কিংবা দুইটি বৃক্ষ পরস্পরের অবস্থান থেকে কত দূরে আছে তা পূর্ববর্ণিত উপায়ে অনুশীলন করলে তোমার দূরত্ব বোঝার শক্তির ক্রমশঃ উন্নতি হবে।

রং চেনার অনুশীলন—পৃথিবীতে আমরা যত রং দেখি তা তিনটি প্রাথমিক (Primary pigment) বা মূল রং দিয়ে তৈরী, এই তিনটি রং-এর নাম হল ব্লু, হলদে ও লাল। হলদে ও ব্লু রং-এর মিলনে সবুজ রং তৈরী হয়। লাল ও হলদের মিলনে কমলা তৈরী হয়। বিভিন্ন পরিমাণে প্রাথমিক রংগুলি মিশিয়ে অজস্র রকম রং তৈরী করা যায় এবং তাদের স্বতন্ত্র নামও আছে। একটি রং-এর দোকান থেকে রং-এর ছবিসুদ্ধ একটি তালিকা বা Colour Chart সংগ্রহ কর এবং ঐ রংগুলি ভাল করে চেন,—যেমন হলদে, বাসন্তী, কমলা, ক্রীম, সবুজ, নীলাভ সবুজ (সী-গ্রীন), লাল, ফিকে লাল (মভ), বেগুনি লাল (পারপল), তামাটে লাল (মেরুন), টকটকে লাল (ক্রিমসন), হলদেটে লাল (স্কার্লেট), চকোলেট, ব্লু বেগুনী, মেরিন-ব্লু, ধূসর, পিঙ্গল (ব্রাউন), সিল্ভার-গ্রে, রূপালি, সোনালী, ইত্যাদি। (এ ছাড়া আরও অজস্র রং পৃথিবীতে আছে)। ফুল, ফল, পাখির পালক, জীবজন্তু, প্রজাপতি, লাল মাছ, রঙিন জামা-কাপড়, ছবির বই অথবা চিত্রকরের আঁকা কোন রঙিন ছবিতে ঐসব রং যখন দেখবে তখন তার নাম চিনতে চেষ্টা করো এবং অন্যান্য রং-এর সঙ্গে তার তফাৎ মিলিয়ে দেখ।

গঠন বৈশিষ্ট্যের অনুশীলন—বস্তুটি দেখতে কেমন, তোমার চেনা কি অচেনা তা বুঝতে হলে বস্তুটিকে খুঁটিয়ে দেখা দরকার। বস্তুটি যদি কোন উদ্ভিদ হয় তাহলে তার পাতার আকৃতি, পাতার কিনারার বৈশিষ্ট্য, গাছে ফুল ফোটে কিনা, ফুল থাকলে ফুলের আকৃতি, গাছটির মোটা-মুটি আকার, উচ্চতা,—এসব ভালভাবে লক্ষ্য করতে হয়। পাখি হলে লক্ষ্য করতে হবে তার ঠোঁট, নখ, ডানা, লেজ, রং, সাইজ। পতঙ্গ হলে মাথা ও শৃঙ্গ, পাখা ও পা লক্ষ্য কর। জন্তু হলে গায়ের চামড়া, মাথার আকার, শিং, চোখ, দাঁত, পায়ের খুর, লেজ, শরীরের দৈর্ঘ্য ও উচ্চতা দেখ। একটি খাতায় তাদের ছবি আঁকো, ছবির নীচে উদ্ভিদ ও প্রাণীর নাম লেখ। অধিকাংশ প্রাণীর দেহ সামঞ্জস্যপূর্ণ, একটি প্রাণীকে লম্বালম্বি চিরে ফেললে অংশ দুটি দেখতে একরকম হয়। কিন্তু উদ্ভিদের দেহের কোন সামঞ্জস্য নেই, উদ্ভিদকে চিরে ফেললে একপাশের ডালপালা ও পাতার সংখ্যা অন্য পাশের ডালপালা ও পাতার সংখ্যার সঙ্গে সমান হবে না।

ঘ্রাণশক্তি

ঘ্রাণশক্তির অনুশীলন—আমরা নাকের সাহায্যে নানা রকম গন্ধ অনুভব করে থাকি। সকল জৈব বস্তুরই কিছু না কিছু বৈশিষ্ট্যপূর্ণ গন্ধ আছে। কাঠের জিনিস, জামা-কাপড়, রং, চামড়া, খাদ্যদ্রব্য, জীবজন্তু, কীটপতঙ্গ, পাখি, মাছ, সাপ, ব্যাঙ, ফুল-ফল, লতা-পাতা, প্রত্যেকেরই নিজস্ব বৈশিষ্ট্যময় গন্ধ আছে। মানুষের ঘ্রাণশক্তি খুব প্রখর নয়, আমরা মোটামুটি বিভিন্ন ফুল, ফল, মাছ, গরু, পাখি, কুকুর, বাঘ ইত্যাদির গায়ের গন্ধের বৈশিষ্ট্য বুঝতে পারি, কিন্তু দুটি একজাতীয় প্রাণীর—যেমন দুটি মানুষের গায়ের গন্ধের তফাৎ বুঝতে পারি না, শিক্ষিত কুকুর বা হাতি তা পারে।

বাগান থেকে নানা রকম ফুল-ফল, লতা-পাতা শিকড় ও নানারকম কাঠ সংগ্রহ কর। প্রতিটি ফুল, ফল, পাতা ও কাঠ ভালভাবে আঘ্রাণ কর, এবং গন্ধটি মনে রাখবার চেষ্টা কর। তুমি চোখ বাঁধা অবস্থায় বসে থাকবে, তোমার বন্ধু তোমার নাকের সামনে একটি একটি করে নানারকম ফুল, ফল, পাতা ও কাঠ ধরবে। তুমি গন্ধ অনুভব করে তার নামটি বলবে। এইভাবে নানারকম ফুলের গন্ধ অনুভব করবার সময় তোমরা নিজেরাই বুঝতে পারবে কুঁড়ি থেকে ফুল ফোটবার সময় গন্ধের তীব্রতা কেমন বৃদ্ধি পায়, বাসি ফুলের গন্ধ কেমন বদলে যায়, দিনরাত্রি ভেদে কিছু কিছু ফুলের গন্ধ কেমন কম-বেশী হয়, বিভিন্ন রকম কাঠের গন্ধ বিভিন্ন রকমের হয়, ইত্যাদি। এই পরীক্ষাটি তারপর নানারকম জৈব-পদার্থ, পশু-পাখি ও নানা জাতের ফল নিয়ে করতে হবে।

শ্রবণ শক্তি

শ্রবণ শক্তির অনুশীলন—আমরা দুই কানের সাহায্যে নানারকম শব্দ শুনে থাকি। আমাদের চারপাশে নানা-রকম পাখি ও জীবজন্তু বিচিত্র স্বরে ডাকে। আমরা যদি মনোযোগ দিয়ে তাদের ভাষা শুনি, আর ঐ সব ভাষা মনে রাখতে চেষ্টা করি, তাহলে ঐ ভাষা শুনেই পাখি বা জন্তুটিকে চিনতে পারব। তাছাড়া শব্দটি কতদূর থেকে আসছে, কোন দিক থেকে আসছে, বার বার অভ্যাসের ফলে তাও বলা যায়।

নিম্নলিখিত পাখিগুলির ডাক খুবই বৈশিষ্ট্যময় এবং সহজে মনে রাখা যায়। গ্রামের মাঠে-ঘাটে এবং কলিকাতার চিড়িয়াখানায় এদের দেখা পাওয়া যেতে পারে এবং ডাকও শোনা যায়। এদের স্বর-বৈচিত্র্য মনে রাখবার চেষ্টা কর,—কোকিল, ময়ূর, পেঁচা, পাপিয়া, কাকাতুয়া, বুলবুল, পায়রা, বসন্তকৌরী, ঘুঘু, কাঠঠোকরা, বেনেবৌ, চিল, শালিক, দাঁড়কাক। ক্রমশঃ এই তালিকাটি বড় করতে হবে।

স্বাদগ্রহণ ক্ষমতা

স্বাদগ্রহণের অনুশীলন—আমরা জিব দিয়ে নানারকম খাদ্যের স্বাদ গ্রহণ করি। বিভিন্ন স্বাদের তারতম্য বোঝবার জন্য কয়েকটি অনুশীলনের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

চারটি জলের গ্লাস নাও। প্রতিটি গ্লাসে সমান পরিমাণ জল রাখ। এখন দশ গ্রামের মত চিনি নাও। দাঁড়িপাল্লার সাহায্যে ওজন করে একটি গ্লাসে এক গ্রাম, আর একটিতে দু-গ্রাম, অপরটিতে তিন গ্রাম এবং শেষ গ্লাসটিতে চার গ্রাম চিনি বেশ ভাল করে জলে মেশাও। তারপর প্রতিটি পাত্র থেকে সামান্য চিনির জল নিয়ে স্বাদ গ্রহণ কর এবং মিষ্টতার তারতম্য বিচার কর। মিশ্রণের কাজটি তোমার অজ্ঞাতে কোন বন্ধু করলে ভাল হয়। চিনির বদলে নানারকম ফলের রস বিভিন্ন মাত্রায় নিয়েও এই অনুশীলনটি করা যেতে পারে। সেখানে মিষ্টতার মাত্রার সঙ্গে ফলের নামও বলতে হবে।

স্পর্শের অনুভূতি

স্পর্শের অনুভূতির অনুশীলন—আমরা ত্বকের বিশেষ করে দুই হাতের তালুর সাহায্যে কোন বস্তুর তাপ, নমনীয়তা, কোমলতা, কাঠিন্য এবং গঠনের বৈশিষ্ট্য অনুভব করে থাকি। বাগান থেকে কিছু ফুল, ফল ও পাতা সংগ্রহ কর, দু-একটি প্রাণীও (যেমন—বিড়াল, মুরগী, খরগোস ইত্যাদি) সংগ্রহ কর। প্রত্যেকটির গায়ে বেশ ভাল করে দু'হাত বুলিয়ে অনুভব কর তার কোমলতা, নমনীয়তা, কাঠিন্য, গঠন বৈশিষ্ট্য ও দেহের উত্তাপ। তারপর চোখ বুজে কিংবা চোখ বাঁধা অবস্থায় এক একটি বস্তু আবার হাতে নিয়ে, হাত বুলিয়ে অনুমান করবার চেষ্টা কর বস্তু বা প্রাণীটির নাম। মিলিয়ে দেখ তোমার অনুমান ঠিক হল কি না। এইভাবে অনুশীলন করলে তোমার স্পর্শের অনুভূতি ক্রমশঃ বাড়তে থাকবে।

তোমাদের পর্যবেক্ষণ করবার ক্ষমতা ক্রমশঃ বাড়ছে কিনা তা সঠিক ভাবে বুঝতে হলে অনুশীলনের ফলা-ফলগুলি প্রতিদিন খাতায় ঠিকমত লিখে রাখতে হবে এবং হিসাব করে দেখতে হবে সঠিক অনুমানের শতকরা হার ধীরে ধীরে বাড়ছে কিনা,—যেমন প্রথম দিন দশবারের মধ্যে পাঁচবার তোমার অনুমান ঠিক হল, এখানে সঠিক অনুমানের শতকরা হার ৫০।

দ্বিতীয় দিন যদি দশবারের মধ্যে ছয়বার ঠিক বলতে পার তাহলে তোমার সঠিক অনুমানের শতকরা হার বেড়ে দাঁড়াবে ৬০। তেমনি আয়তন ও ওজনের বেলায় সঠিক সংখ্যাটির ক্রমশঃ কাছাকাছি আসছ কিনা লক্ষ্য কর, কতটা কাছে এলে? তার পরিমাণ দেখেই বুঝতে পারবে তোমার পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা বাড়ছে কিনা।

প্রকৃতির রহস্য ঠিকমতো বুঝতে হলে, তার সকল বৈশিষ্ট্য নিখুঁতভাবে জানতে হলে প্রকৃতির নিজস্ব হাতিয়ার এই পর্যবেক্ষণ শক্তিকে আমাদের ঠিকমত কাজে লাগাতে হবে। এই শক্তির অনুশীলনের সময় এবং ব্যবহারের সময় আমাদের অশেষ ধৈর্য ও একাগ্র মনো-সংযোগের প্রয়োজন। মনোসংযোগ ছাড়া পর্যবেক্ষণ সম্ভব নয়। নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছ ক্লাশে মাস্টার মশাই যখন পড়ান সেই সময় তুমি যদি অন্য কথা চিন্তা কর তাহলে মাস্টার মহাশয়ের কোন কথাই শুনতে পাও না, শুনলেও তা বুঝতে পার না। এই মনোসংযোগ ক্রমশঃ বাড়াবারও একটা সুন্দর অনুশীলন আছে। তোমরা এটা করে দেখতে পার।

ক্লাশে মাস্টার মশাই যখন পড়াবেন তখন তুমি সামনে সেদিনের তারিখ লেখা একটি সাদা কাগজ রেখে দেবে, যখনই তোমার মন কোন কারণে বিক্ষিপ্ত হবে, অন্য চিন্তা মনে আসবে, তখনই কাগজের উপর একটি বিন্দু বা ডট চিহ্ন আঁকবে। ক্লাশ শেষ হলে ডটগুলি গুণে দেখবে কতবার তোমার মন বিক্ষিপ্ত হয়েছিল। চেষ্টা করবে পরদিন আরো বেশী একাগ্র মনে কথা শোনার। প্রতিদিন এক ঘণ্টা করে অন্ততঃ তিন মাস মনোসংযোগের এই অনুশীলন করবে। যদি আন্তরিকভাবে চেষ্টা কর তাহলে নিশ্চয় তুমি সফল হবে। কাগজে ডটের সংখ্যা ধীরে ধীরে কমে আসবে, অর্থাৎ কোন বিষয়ের ওপর মন একাগ্র করবার ক্ষমতা তোমার ক্রমশঃ বাড়বে।

সার্কুলার গার্ডেন রোড, কলিকাতা-২৯

কাঠঠোকরা পাখিদের কথা

অজয় হোম

জগতে পাখির যত প্রজাতি (স্পিসিস্) আছে তার অর্ধেকের উপর দণ্ডচারী বর্গের (অর্ডার পাসেরিফরমেস) মধ্যে পড়ে।[১]

কাষ্ঠকুট্ট বর্গে (অর্ডার পাইকিফরমেস) মাত্র তিনটি বংশ—কাষ্ঠকুট্ট (পাইকিদি), মধুমাক্ষিক (ইনডিকেটোরিদি) এবং পিপ্পল (কাপিটোনিদি)। একমাত্র মধুমাক্ষিক কোনো বঙ্গেই সমতলের পাখি নয়। খুবই দুষ্প্রাপ্য পাহাড়ী পাখি। হিমালয়ের বাম্ন, হাজারা, মারি থেকে নেপাল, ভূটান, সিকিম, আসামের নাগা পাহাড়, মার্গারিটা এবং উত্তর ব্রহ্মদেশে মিচিনা জেলায় দেখা যায়। ভারতের মধুমাক্ষিকরা আফ্রিকার পাখির মতো মানুষ এবং মধুভুক-কে (র‍্যাটেল; মেল্লিভোরা কাপেনসিস) নানারকম ডাক ডেকে দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রে মৌচাকের কাছে পথ দেখিয়ে নিয়ে যায় কিনা তা এখনও জানা যায়নি। আসামে একবার মাত্র আমার দৃষ্টিপথে পড়েছে। হয়তো কোনো কারণে নেমে এসেছিল। তখন চিনতে পারিনি, চেহারা লিপিবদ্ধ করে রেখেছিলাম, পরে বই মিলিয়ে জানি ওটা মধুমাক্ষিক।[২]

কাষ্ঠকুট্ট বংশের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে দুটো আঙুল সামনে, দুটো পিছনে এবং প্রথম ও চতুর্থ আঙুলের নখরের মুখ পিছন দিকে! পরভৃত, শুক ইত্যাদি বংশের মতো কাষ্ঠকুট্ট বৃহৎ যুগ্মাঙ্গুল গোষ্ঠীর (জাইগোড্যাকটাইলাস) অন্তর্ভুক্ত হলেও উপরোক্ত দুই বিশিষ্টতার জন্যে পৃথক।

এই বংশের পাখিদের জিভ লম্বা লিকলিকে এবং আঠাযুক্ত। জিভের ডগা করাতের মতো কাঁটাযুক্ত। লেজের পালকের সংখ্যা ১২। লেজের বাইরের এক জোড়া পালক খুব ছোটো। চঞ্চু সুদৃঢ়; অনেক প্রজাতির কীলকাকার।

কাষ্ঠকুট্ট বংশে ১৫টি গণ (জিনাস)—ব্যঙ্গি (ডাইনোপিয়াম), লঘুপর্ণিক (মাইক্রপটেরনাস), দারুকুট্ট (পাইকয়েডস্), ক্ষুদ্রপুচ্ছ (হেমিকিরকাস), কাষ্ঠকুট্ট (পাইকাস), সাচিগ্রীব (জাইংক্স্), কাষ্ঠকুট্টিকা (পাইক্যুমনাস), কীচকি (সাসিয়া), ত্রয়ঙ্গুলি (গেকিনুলাস), ভস্মিশতপত্র (মুললেরিপাইকাস), কুম্কুমচূড় (ড্রাইওকোপাস) বিচূড় (হাইপোপাইকাস), কৃষ্ণপাট (পাইকয়িডেস), রক্তপাট (ব্রাইথিপাইকাস) এবং দৃঢ়পাদ (ক্রাইসোকোলাপটেস)।

এই ১৫টি গণের মধ্যে একমাত্র ব্যঙ্গি গণের প্রজাতিই পশ্চিমবঙ্গের সমতলে সবচেয়ে বেশি লোকচক্ষে পড়ে। আর দু-তিনটিকে সমতলে দেখা গেলেও বাকি সবই হিমালয়ের পাদদেশ দার্জিলিঙ জেলা ও তরাই অঞ্চলবাসী।

কাঠঠোকরা

ছুটির দিনে কলকাতা ছেড়ে কিছু দূরে কোথাও যখন আর পাখি দেখতে যাবার জায়গা থাকে না, তখন হয় যাই আলিপুরের চিড়িয়াখানায় না হয় শিবপুরের বটানিক্যাল গার্ডেনে।

সেদিন বেশ সকালে বটানিকসে পৌঁছেছি। গেটে ঢুকেই ডানহাতি রাস্তা দিয়ে চলেছি। শীতের মরসুম নয় তাই দর্শক আর চড়ুইভাতির ভিড় নেই। লোকজনের মধ্যে বাগানের মালিরাই যা কিছু কাজ করছে। রাস্তাটা বেশ নির্জন।

হঠাৎ নির্জনতা ভঙ্গ করে শুনতে পেলাম উচ্চৈঃস্বরে কর্কশ গলায় 'কি-কি কি-খি-খি —' ভুতুড়ে হাসি। অন্যমনস্ক ছিলাম তাই ভুতুড়ে হাসিতে চমকে উঠে লক্ষ্য করতে লাগলাম শব্দটা কোথা থেকে আসছে। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই আমার চোখের সামনে দিয়ে সোনালি-হলুদ, লাল আর কালোর ছটা ছড়িয়ে অদ্ভুত হাসি উড়িয়ে উড়ে গেল একটা পাখি।

ওড়ার কায়দাতে নতুনত্ব আছে। পাখাজোড়া খুব জোরে কয়েক দফা চালিয়েই বন্ধ ক'রে ফেলে। সেই গতিবেগে খানিকটা সোজা গিয়েই নিজের ভারে শূন্য পথে ডুব দেয়; সঙ্গে সঙ্গে আবার দ্রুত পাখা সঞ্চালনে নিজেকে উত্তোলন তারপর আবার ডুব। সমস্ত ওড়াটাই কিরকম

১। বাংলার পাখি, অজয় হোম, ১৩৮০

২। মৌ-সন্ধানী, দেশ ২২ বর্ষ, ২৩ সংখ্যা, ২৬ চৈত্র ১৩৬১, পৃঃ ৭০৯-১৩

যেন স্বাচ্ছন্দ্যের নয় বলে মনে হল। মনে হল উড়তে এদের বেশ কষ্ট হচ্ছে।

এভাবে উত্থান-পতন ওড়ার মাধ্যমে রাস্তা পার হয়ে এক মাঝারি সাইজের গাছের প্রায় গোড়া ঘেঁষে আঁকড়ে ধরল কাণ্ডটাকে। মাটি থেকে বড়জোর চার পাঁচ ফুট উঁচু হবে। দু'পা আর দেহের অনুপাতে ছোটো লেজের উপর ভর দিয়ে মাথা উঁচু করে এদিক ওদিক তাকাল। মাথায় লাল ঝুঁটি। কর্কশ স্বরে আবার ডেকে উঠল—'কি-কি-কি-খি-খি-খি—।' তারপরেই লম্বা চঞ্চু দিয়ে গাছের গায়ে হাতুড়ির মতো ঠুকতে লাগল। কখনও সরসর করে কাঠবেড়ালির মতো ওপরে ওঠে, কখনওবা পিছু হঠে নেমে আসে। ওঠানামা দুই-ই দ্রুত এবং ঝাঁকি দেওয়া।

চঞ্চু-হাতুড়ি ঠোকার বিরাম নেই। ডাইনে বাঁয়ে সামনে ঠুকেই চলেছে। এই করতে করতে কাণ্ডটার উপরে উঠতে লাগল। দেখলাম, চঞ্চুর আঘাতে ছোটো ঘুণপোকা বেরিয়ে আসছে আর সেগুলো জিভের আগায় ধরে উদরে চালান দেওয়াতেই পাখিটা ব্যস্ত। থেকে থেকে ওই ভুতুড়ে হাসির ডাক। হঠাৎ ডাকের জবাব দিয়ে আর একটা পাখি কোথা থেকে উড়ে এসে গাছের কাণ্ডটার উল্টো দিকে আমার চোখের আড়ালে বসল। উড়ে আসার সময় মাথাটা কালো দেখলাম। ওরই সঙ্গিনী।

পাখি দুটি কাঠকুট্ট বর্গের অন্তর্গত কাঠকুট্ট বংশে ব্যঙ্গি গণের (ডাইনোপিয়াম) এক প্রজাতি; নাম—কাঠঠোকরা (ডাইনোপিয়াম বেংঘলেনস্)। হিন্দী—কাঠফোড়া। ইংরেজি—গোল্ডেনব্যাকড্ উডপেকার। ব্যঙ্গি গণে ৩টি প্রজাতি।

কাঠঠোকরা লম্বায় ১১ ইঞ্চি। পুরুষ-পাখির মাথার উপর এবং ঝুঁটি উজ্জ্বল টুকটুকে লাল; ওই লালের উপর কয়েকটি কালো ছিট। মাথা ও ঘাড়ের দু'পাশ সাদা। ন্যাকের উপর থেকে চোখ পার হয়ে কালো চওড়া রেখা ঘাড় পর্যন্ত। ঘাড়, পিঠের শেষাংশ ও লেজ কালো। উপরের পিঠ ও কাঁধ গাঢ় সোনালি-হলুদ। ডানার আচ্ছাদক ঘাড়ের দিকে কালো, ক্রমে সোনালি জলপাই-হলুদ। ওড়ার পালক পাটকিলে-কালো, তার উপর সাদা ছোপ, বাকি ডানার পালক সোনালি জলপাই-হলুদ। চিবুক, গলা ও ঘাড়ের দু'পাশ কালো, তার উপর অসংখ্য ছিট। এইভাবে নেমে এসেছে বুকের উপর দিয়ে। পেট ও তলপেটে সাদার উপর কালো কাটাকুটি দাগ, ক্রমে তলপেটের শেষে এসে প্রায় সাদা। স্ত্রী-পাখির কেবল মাথার সামনেটা কালো এবং প্রতিটি পালকে ত্রিকোণাকার সাদা রেখা। কনীনিকা লালচে-পাটকিলে, চোখের গোল পাতা সবুজাভ-সীসে। চঞ্চু স্লেট-সীসে। পা গাঢ় সবুজাভ-সীসে, নখর ছাই রঙা।

বাসস্থান—পাকিস্তান, ভারত, বাংলাদেশ, নেপাল এবং শ্রীলঙ্কা। ৬টি উপজাতি। প্রথম (ডি বেং বেংঘলেনস্)—পাঞ্জাব, উত্তরপ্রদেশ, নেপাল, বিহার, পশ্চিমবঙ্গ, বাংলাদেশ, আসাম; দক্ষিণে মধ্য ভারত এবং ওড়িশায় তিন হাজার ফুটের ভিতর। দ্বিতীয় 'সিন্দ্ গোল্ডেনব্যাকড্' (ডি বেং ডাইল্যুটাম)—পাকিস্তান, বেলুচিস্তান, রাজস্থান, সৌরাষ্ট্র ও নিম্ন পাঞ্জাব। তৃতীয় 'সাদার্ন গোল্ডেনব্যাকড্' (ডি বেং পাংকটিকোললে)—গোদাবরী নদীর পূর্ব এবং দক্ষিণাংশে। চতুর্থ 'কেরালা গোল্ডেনব্যাকড্' (ডি বেং তেহমিনি)—ভারতের পশ্চিম উপকূল ধরে কেরালায়। পঞ্চম 'সিলোন গোল্ডেনব্যাকড্' (ডি বেং জ্যাফনেনসে)—উত্তর শ্রীলঙ্কা; দক্ষিণে ত্রিণকোমালী এবং পুট্টালামে। ষষ্ঠ 'সিলোন রেডব্যাকড্' (ডি বেং সারোডেস)—শ্রীলঙ্কার মধ্য ও দক্ষিণাংশে দু'হাজার ফুটের ভিতর।

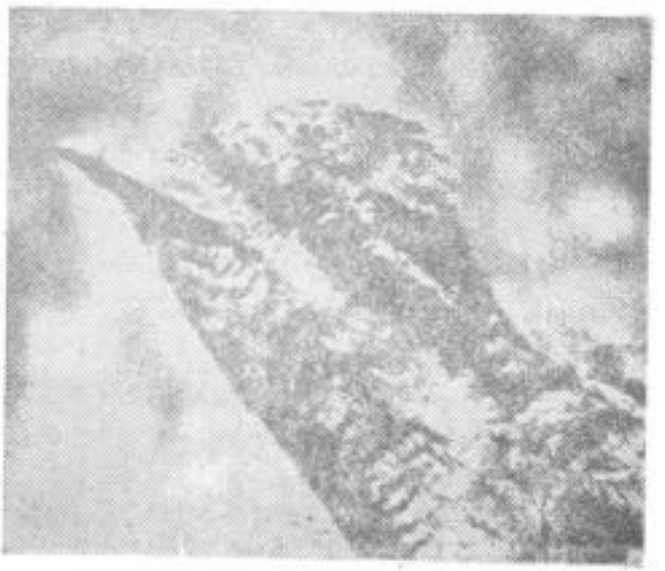

বক্রিমগ্রীব

খাদ্য- গাছের, গায়ে এবং বল্কলের অভ্যন্তে যাবতীয় ছোটবড়ো কীট, শূক, উই এবং কাঠ বা ডেঁয়ো পিঁপড়ে। এ ছাড়া পাকা ফলের শাঁস এবং ফুলের মধু।

স্বভাব—কাঠঠোকরা গ্রাম বাংলার অতি সাধারণ পাখি। কলকাতার উপকণ্ঠে যে কোনও বাগানে এদের আগমন ঘটে। আম, নারকেল অথবা বুড়ো গাছ এবং কিছুটা ঝোপঝাড় যে বাগানে আছে সেখানে একটি বা দুটি সোনালি-পিঠ কাঠঠোকরাকে দেখা যাবেই এবং এদের

কর্কশ ডাকও কানে আসবে। এদের ডাকের সঙ্গে মাছরাঙার ডাকের খুবই সাদৃশ্য। এরা ঘন জঙ্গল পছন্দ করে না বরং এড়িয়ে চলে।

কাঠকুট্ট বংশের মধ্যে পল্লীবাংলার এই কাঠঠোকরার যেমন রঙ তেমন আর কোনও প্রজাতিতে নেই। সাহসও এদের বেশ। লুকিয়ে চুকিয়ে কিছু করে না। বাগান কাঁপিয়ে ডেকে, রঙের ছটা উড়িয়ে অন্য প্রাণীর সামনেই সে তার খাদ্যান্বেষণ করে চলে। কোনও ভ্রুক্ষেপ করে না। নিজের এলাকাতেই বসবাস করে। দলবদ্ধ হয়ে বাস করতে এরা মোটেই ভালোবাসে না।

কাঠঠোকরার শিকার বা খাদ্যান্বেষণ প্রণালীটি বড়োই কৌতূহলোদ্দীপক। যে গাছটিকে তার খাদ্যভূমি বলে বাছে, সেগাছে প্রায় গুঁড়ি থেকে খাবার খোঁজা শুরু করে।

অন্যান্য পাখিরা সচরাচর যেভাবে আড়াআড়ি ভাবে গাছের ডালে বসে সেভাবে এরা কখনই বসে না। কাণ্ড বা ডাল যাই হোক না কেন এরা বসে লম্বালম্বিভাবে নখরের সাহায্যে কীলকাকার লেজের উপর সম্পূর্ণ ভর দিয়ে আঁকড়ে ধরে। তারপর লম্বা গলাসমেত মাথা ডাঁচু করে ঝাঁকানি দিয়ে দিয়ে ওপরে ওঠে, ঘুরে ঘুরে পাশে যায়; আবার কখনওবা মোটরগাড়ির ব্যাকগিয়ারের মতো ওই অবস্থায় ঝাঁকানি দিয়ে পিছনে নেমে আসে, কোথাও একটা শিকার ছেড়ে গেছে তার অবস্থান যখন বুঝতে পারে। নখর দিয়ে গাছ আঁকড়ানো মানে গাছের ছালে চঞ্চুর আঘাতে ঢাকনা উঠিয়ে কীট অন্বেষণ বা আওয়াজে কীট বার হয়ে আসার অপেক্ষা। সামান্যতম ফাঁকের মধ্যে লুকিয়ে থাকলেও এদের হাত থেকে পরিত্রাণ নেই। আগায় বুরুশের মতো কাঁটাওয়ালা আঠামাখানো লকলকে লম্বা জিভ দিয়ে ঠিক গেঁথে বের ক'রে আনবে। গাছের গায়ে ঝুঁটসমেত চঞ্চুর আঘাত দেখলে মনে হয়, ছোটো গাঁইতি দিয়ে কে যেন গাছের গায়ে মেরেই চলেছে—ঠকাঠক্ ঠকাঠক্…। এই আওয়াজ বেশ জোরে এবং দিনের বেলা বাংলার পল্লীকাননে প্রায়ই শোনা যায়।

কাঠঠোকরাকে মাঝে মাঝে মাটিতে নেমেও খাদ্যসংগ্রহ করতে দেখা যায়। এটা ঘটে বড়ো লাল ডেঁয়ে বা কাঠাপিঁপড়ের বেলায়। কাঠঠোকরাদের দেহের গঠন, নখর, আঙুল সবই গাছের উপর থাকা বা গাছকে আঁকড়ে ধরার উপযোগী। তা সত্ত্বেও তারা মাটিতে নামে। কোনও কারণে তাদের এই বিবর্তন ঘটছে। হয়তো একদিন সম্পূর্ণ ভূমিকীটভোজী হয়ে যাবে। অবশ্য তা হতে কয়েকশ' বছর নিশ্চয়ই লাগবে। এই স্বভাব প্রথম লক্ষ্য করেন ইংল্যাণ্ডের সাফোক অঞ্চলের ই. সেলাস ১৯০০ খ্রীস্টাব্দে কাঠকুট্টগণের (পাইকাস) বড়ো সবুজ কাঠঠোকরার ভিতর।

কাঠঠোকরার প্রজননকাল মার্চ থেকে আগস্ট। গাছের কাণ্ডে বা ডালের গায়ে ৮ থেকে ৩০ ফুটের মধ্যে কাঠঠোকরা-দম্পতি চঞ্চুকে কুড়ুলের মতো ব্যবহার ক'রে বারবার আঘাত ক'রে অতি পরিপাটি সুগোল প্রায় ৩ ইঞ্চি ব্যাসের এক প্রবেশ দ্বার বানিয়ে খুঁড়ে চলে। গোলাকার গর্তমুখটি এমন নিখুঁত যে মনে হয় কোনও দক্ষ ছুতোর বানিয়েছে। গর্তমুখ থেকে ভিতরে বেশ কয়েক ইঞ্চি সোজা খোঁড়ে, তারপর কিছুটা নিচের দিকে নামে। সেই নিচে ৬ ইঞ্চি ব্যাসের ডিম্বাকৃতি ডিম পাড়ার ঘর তৈরী করে। অন্যান্য পাখিরা যেমন কোনও কিছু বিছিয়ে শয্যা রচনা করে, ওরা কিন্তু কিছুই বিছায় না। ওরই উপর ৩টি খুব চকচকে ধবধবে সাদা উপরদিকটা কিছু সূঁচাল ডিম পাড়ে। ঘর-গেরস্তালীর সকল কাজে স্ত্রী-পুরুষ দুজনেই পরস্পরকে সাহায্য করে। ডিমের মাপ—লম্বায় ১·১০, চওড়ায় ০·৮০ ইঞ্চি।

অন্যান্য কাঠঠোকরা

পশ্চিমবঙ্গের সমতলে আরও কয়েকটি কাঠঠোকরা আমার দৃষ্টিপথে এসেছে। তাদের মধ্যে দু'একটি পার্বত্য-বাসী হলেও সমতলে নামতে দেখেছি। তারা হল—

লাল কাঠঠোকরা

১। **লাল কাঠঠোকরা** (মাইক্রপটেরনাস ব্রকাই-উরাস)। হিন্দী—কাঠ-ফোড়া। সব কাঠঠোকরারই হিন্দী নাম এই। ইংরেজি—ব্রুফাস উডপেকার। লঘুপক্ষিক গণের (মাইক্রপ-ঠেরনাস) প্রজাতি। এই গণে একটি মাত্র প্রজাতি। লম্বায় ১০ ইঞ্চি। দেহের সমস্ত পালক বাদামীপাটকিলে, নিম্নাংশ নিষ্প্রভ এবং গাঢ়। এই বাদামী-পাটকিলের উপর মাথায় ছাই রঙের আভা, প্রতিটিপালকের ধার খুব অল্প ফিকে, পিঠে ডানায় লেজে এবং তলার পালকে আড়াআড়ি কালো ছোটো ছোটো টানা

দাগ। ঠিক চোখের তলায় কিছুটা পালক টুকটুকে লাল। চিবুক ও গলার পালকের ধার জরদাভ। স্ত্রী-পাখির কেবল চোখের তলায় লাল ছোপটা নেই। কনীনিকা পাটকিলে-লাল। চঞ্চু কালচে-পাটকিলে; তলার চঞ্চুর গোড়া সীসে। পা এবং নখর ধূসরাভ-পাটকিলে।

বাসস্থান—হিমালয় থেকে দক্ষিণে শ্রীলঙ্কা পর্যন্ত; ৩টি উপজাতি। যেটিকে (মা ব্রা ফাইওকেপস্) দেখি তার বাসস্থান নেপাল থেকে হিমালয়ের পাদদেশ ধরে বাংলাদেশ, পশ্চিমবঙ্গ, ওড়িশা এবং অন্ধ্রের বিশাখাপত্তনম।

স্বভাব—লাল কাঠঠোকরা গভীর জঙ্গলের পাখি নয়। পছন্দ করে কলাবাগান, চা-বাগান; খোলামেলা চাষের জমি যার পাশে ঝোপঝাড় এবং বাঁশবন। সাধারণত একাই বিচরণ করে বেশি। খুব বড়ো দলে সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে কখনও বিচরণ করে না। গাছের খুব উঁচুতে কখনও শিকার করে না। খুব নিচের কাণ্ডেই খাদ্য অন্বেষণ করে, সময়ে সময়ে মাটিতে নেমেই পিঁপড়ে ধরে। এদের ডাকটা উচ্চগ্রামে—'কি-ই-ইক্'···কি-ই-ক···কি-ই-ইক্'। অনেকটা শালিকের ডাকের মতন।

প্রজননকাল ফেব্রুয়ারি থেকে এপ্রিল। কাঠপিঁপড়ের বাসায় চঞ্চু দিয়ে গর্ত করে বাসা বানায়। খাদ্য-খাদক সম্বন্ধ হলেও ওই জ্যান্ত যারা একবার কামড়ে ধরলে আর সহজে ছাড়ে না সেই ভীষণ হিংস্র পিঁপড়ের সঙ্গে কি করে যে বাস করে এটাই খুব আশ্চর্য লাগে। এমনকি ডিম বা সদ্যোজাত ছানারও কোনো অনিষ্ট করে না। ডিম পাড়ে ২-৩টি ধবধবে সাদা কিন্তু চকচকে নয়। ডিমের মাপ—লম্বায় ১·০০, চওড়ায় ০·৭৫ ইঞ্চি।

২। **জরদ কাঠঠোকরা** (পাইকয়েডস্ ম্যাকেই)। হিন্দী—কাঠফোড়া। ইংরেজি—ফালভাস-ব্রেস্টেড উডপেকার। দারুকুট্ট গণের (পাইকয়েডস্) একটি প্রজাতি। এই গণে ১১টি প্রজাতি।

লম্বায় সাড়ে ৭ ইঞ্চি। মাথার চাঁদি ও ঝুঁটি টুকটুকে লাল, ঘাড় ও পিঠের উপরের অংশ এবং লেজের আচ্ছাদক কালো, বাকি উপরের পালক চওড়া সাদা ও কালোর ডোরা কাটা। ডানা কালো, তার উপর সাদা ছিট। লেজ কালো, তার উপরে সাদা ছিট, কয়েকটি পালকে সাদা-কালোর ডোরা। চোখের চারপাশ, গাল এবং ঘাড়ের দুপাশ জরদাভ-সাদা। চোখের উপর দিয়ে কালো টান কানের উপর পর্যন্ত। চিবুক ও গলা ফিকে জরদাভ থেকে ক্রমে বুকের উপরাংশে গাঢ়। বুকের নিম্নাংশ, উদর ও তলপেটে জরদাভর উপর কালো পাটকিলে ও ধূসরের সরু দাগ। লেজের তলা টুকটুকে লাল। কনীনিকা পাটকিলে। চঞ্চু সীসে রঙা। পা ও নখর নিস্প্রভ সবুজাভ। স্ত্রী-পাখির মাথা ও ঝুঁটি সব কালো।

বাসস্থান—ভারত, নেপাল, বাংলাদেশ ও ব্রহ্মদেশ। ২টি উপজাতি। যেটিকে দেখতে পাই (পা মা মাকেই) পশ্চিম হিমালয়ের মারী থেকে পূবে নেপাল হয়ে পশ্চিমবঙ্গ, বাংলাদেশ, আসাম, ভূটান এবং উত্তর ব্রহ্মদেশ, দক্ষিণে মান্দ্রাজের পূর্বঘাটে। অপরটি আন্দামানের (পা মা আন্দামানেনসিস), 'স্পটেড ব্রেস্টেড পায়েড উডপেকার'।

স্বভাব—জরদ কাঠঠোকরা একটু চুপচাপ থাকতে ভালবাসে। আমার নজরে পড়ে বর্ধমান জেলায় শক্তিগড় ও মসাগ্রামের মাঝে। ডাকে অদ্ভুত 'চিক্‌চিক্' স্বরে, যার তুলনা হতে পারে একমাত্র ইঁদুরের সঙ্গে। পিঁপড়েই প্রধান খাদ্য এবং তা সংগ্রহ করে মাটি ও গাছ দু'জায়গা থেকেই।

প্রজননকাল এপ্রিল থেকে জুলাই। পুরুষ-পাখি প্রায় সারাদিন ডিমে তা দেয়। মনে হয় স্ত্রী-পাখির ডিউটিটা রাত্রিতেই। ডিম পাড়ে ৩ থেকে ৫টি, সাদা।

৩। **ছোটো কাঠঠোকরা** (পাইকয়েডস্ নানুস)। হিন্দী—কাঠফোড়া। ইংরেজী—পিগমি উডপেকার। দারুকুট্ট গণের একটি প্রজাতি।

লম্বায় সাড়ে ৪ ইঞ্চি। স্ত্রী-পুরুষ একই দেখতে। মাথা ফিকে হলুদ-পাটকিলে। উপরের পালক ফিকে পাটকিলে, সাদার ভাবটা একটু বেশি বিশেষত উপরের লেজের আচ্ছাদকে যার উপর কালো ডোরা দাগ। চিবুক ও গলায় একটু কালো ভাব, বাকি তলার পালক সাদাটে তার উপর ফিকে কালচে-পাটকিলের ডোরা দাগ। কনীনিকা ফিকে হলুদ; চোখের পাতা লালচে। চঞ্চু, পা ও আঙুল সীসে রঙা।

বাসস্থান—পাকিস্তান, ভারত, বাংলাদেশ ও শ্রীলঙ্কা। ৪টি উপজাতি। যেটিকে দেখতে পাই তার বাসস্থান। (পা না নানুস)—পাকিস্তান থেকে নেপাল, উত্তরপ্রদেশ, বিহার, ওড়িশা, পশ্চিমবঙ্গ এবং বাংলাদেশে।

স্বভাব—ছোটো কাঠঠোকরা খুব চটপটে এবং সাধারণত জোড়ায় বিচরণ করে। গাছের উঁচু ডালের দিকেই ঘোরাফেরা করতে দেখা যায়। বড়জাতের কাঠঠোকরাদের মতো সরসর করে উপরে উঠতে বা পিছু হটতে পারে না। ওড়াটা অবশ্য বংশানুযায়ী। কিন্তু এরা খাদ্যান্বেষণের সময় এক ডাল থেকে অন্য ডালে ঘনঘন যাওয়া-আসা করে যা বড়োরা করে না। ডাকে একটু তীক্ষ্ণস্বরে—'চিপ্...চিপ্'। মেদিনীপুর এবং বীরভূমে একটু বেশি দেখা যায়। বিহারে সবচেয়ে বেশি। হাজারিবাগ জেলার গিরিডিতে আমগাছে

বাসা বাঁধতে দেখেছি। রোজ সকালে উড়ে এসে বসতো আমগাছ ছেড়ে হরতুকী গাছের মাথায়। বাসার ছাঁদাটা করেছিল প্রায় ১৫ ফুট উঁচুতে একটা সরু ডাল ভেঙে গিয়েছিল, সেখানে যে দাগ ছিল তাই ছাঁদা করে। কারণ, এরকম জায়গা অন্য জায়গা থেকে নরম বলে গর্ত করার সুবিধে। ছাঁদার মুখটা ছিল এক ইঞ্চির মতো।

প্রজননকাল ফেব্রুয়ারি থেকে জুলাই। বাসা বানায় ৫ থেকে ৪০ ফুটের ভিতর। ডিম পাড়ে ৩-৪টি ধবধবে সাদা।

৭। **সোনালি কাঠঠোকরা** (ক্রাইসোকোলাপটেস ল্যুকিডাস)। হিন্দী—কাঠফোড়া। ইংরেজি—লার্জার গোল্ডেনব্যাকড্ উডপেকার। দৃঢ়পাদ গণের (ক্রাইসোকোলাপটেস) এক প্রজাতি। এই গণে ২টি প্রজাতি।

লম্বায় সাড়ে ১২ ইঞ্চি। কপালের ধার ও চোখের পাশ পাটকিলে: মাথা ও ঝুঁটি টুকটুকে লাল, ধারে কালো একটা টান, চোখের কোণ থেকে কানের পালকের উপর দিয়ে চওড়া কালো এক টান। পিঠ ও ডানার বেশ কিছু অংশ সোনালি জলপাই হলুদ, পালকের ধার ধাতব সোনালি, বাকি পাটকিলে। বস্তিপ্রদেশ টকটকে লাল। লেজ কালো। গাল চিবুক এবং গলা সাদা, তার উপর পাঁচটি সরু কালো টান পরস্পরের সঙ্গে মিশে গিয়েছে ঘাড়ে। বাকি তলার পালক ময়লা সাদা, প্রতিটি পালকের ধার কালো যা বুকের কাছে চওড়া আর পেটের দিকে খুব সরু। স্ত্রী-পাখির কেবল মাথা ও ঝুঁটিতে কালোর উপর সাদা ফুটকি। কনীনিকা হলুদ। চঞ্চু নীলচে-পাটকিলে। পা সবুজাভ-পাটকিলে।

বাসস্থান—ভারত, বাংলাদেশ থেকে পূর্বে ইন্দোচীন, মালয়েশিয়া থেকে ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ। ৪টি উপজাতি। যেটিকে দেখতে পাই (ক্রা ল্যু গুট্টাক্রিস্টাটাস)—নেপাল থেকে আসাম, বাংলাদেশ, পশ্চিমবঙ্গ, ওড়িশা, অন্ধ্রে বিশাখাপত্তনম এবং মধ্যপ্রদেশের বস্তার অঞ্চলে।

স্বভাব—সোনালি কাঠঠোকরা গভীর জঙ্গলের পাখি। কখনও কখনও অতটা জঙ্গল না হলেও যেখানে ঝোপঝাড়ের মধ্যে বাঁশবন আছে সেরকম সাধারণ জঙ্গলেও জোড়ায় বিচরণ করতে দেখা যায়। গাছে গাছেই শিকার ধরে বেড়ায়। তবে মাটিতে নেমেও পিঁপড়ে এবং উই খায়। গলার স্বর কর্কশ। এক গাছ থেকে অপর গাছে উড়ে যেতেও যেমন ডাকে, তেমনি গাছ আঁকড়ে বসে ও ডাকতে ডাকতে চলাফেরা করে।

প্রজননকাল মার্চ থেকে জুলাই। বাসা বানাবার জন্যে ৫ থেকে ১৫ ফুটের মধ্যেই গাছের গায়ে প্রায় ৪ ইঞ্চি ব্যাসের ছাঁদা করে। সুড়ঙ্গটা ৬ থেকে ১৮ ইঞ্চি পর্যন্ত লম্বা হতে দেখা গেছে। ডিম পাড়ে ৪-৫টি সাদা রঙের।

৫। **বঙ্কিম গ্রীব** (জাইংকস টরকিলা)। নামটি দেওয়া প্রদ্যোৎ কুমার সেনগুপ্ত মহাশয়ের।[১] হিন্দী—গর্দান আঁয়ধা। ইংরেজি—রাইনেক। সাচিগ্রীব গণে (জাইংকস্) একটি প্রজাতি।

লম্বায় সাড়ে ৭ ইঞ্চি। স্ত্রী-পুরুষ একই দেখতে। লেজসমেত উপরের পালক ধূসর-পাটকিলে, কিছু পালকে সাদা ছিট ও কালো সরু টান। ঘাড়ের কাছ থেকে পিঠের নিচে তিনটি ভাঙা লম্বা কালো টান, ভাঙা জায়গায় উপরের অন্যান্য পালকের চেয়ে একটু লালচে ভাব বেশি। পিঠের মতো ডানার আচ্ছাদকে ছিট কিছু বেশি এবং প্রকট। মাথার দু'পাশ, চিবুক গলা এবং বুকের উপরাংশ ফিকে বাদামী, তার উপর খুব সরু কালো ডোরা। বাকি তলার পালক ফিকে হলুদাভ সাদাটে, তার উপর তীরের ফলার মতো কালো দাগ। কনীনিকা পাটকিলে। মাঝারি আকারের সরু চাপা চঞ্চু, পা এবং আঙুল ফিকে পাটকিলে-সীসে।

বাসস্থান—ইউরোপ থেকে এশিয়া, জাপান। ভারতে ২টি উপজাতি। যেটিকে শীতকালে পরিযায়ী হয়ে আসতে দেখি (জা টর্ক চাইনেনসিস)—বেলুচিস্তান, উত্তর পশ্চিম সীমান্ত থেকে কাশ্মীর। শীতে পরিযায়ী হয় ভারতের পূর্বাংশ বিহার, পশ্চিমবঙ্গ, বাংলাদেশ এবং আসামে।

স্বভাব—বঙ্কিমগ্রীব অন্যান্য কাঠঠোকরার মতো একই ভাবে খাদ্য সংগ্রহ করে এবং মাটিতে নামে। প্রধান খাদ্য পিঁপড়ে এবং উই। সবচেয়ে আশ্চর্য এর ঘাড়-গলা ফেরানোর ভঙ্গিমা। যার জন্যে এদের চিনতে কখনও ভুল হয় না। বঙ্কিমগ্রীবের সঠিক পরিচয় দিয়েছেন ভারতীয় পক্ষিতত্ত্ব পতিষ্ঠাতাদের অন্যতম এডওয়ার্ড ব্লাইথ। তিনি বলেছেন, 'প্রকৃতিগতভাবে নিজের দেহবর্ণের সঙ্গে যতদূর মিল সম্ভব সেই রকম স্থানে নেমে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে শুয়ে থাকে। ভাবটা যেন খুব অসুস্থ। সে সময়ে যদি কেউ হাতে তুলে নেয় তাহলেও কিছু বলে না, যেন অন্তিমকাল উপস্থিত। এরকম অবস্থায় অদ্ভুতভাবে চোখ উলটে ঘাড় ঘোরাতে ফেরাতে থাকে, গলা এবং মাথার পালক খাড়া করে মাঝে মাঝে লেজ তুলে এমন হাস্যকর অঙ্গভঙ্গি করতে থাকে যে মানুষ অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে। আর সেই অবসরে তীরের বেগে হঠাৎ উড়ে চম্পট মারে।'

১ Sen Gupta, P. K., Birds around Santiniketan, Visvabharati News, vol. XXIII, No, 12, June 1955, P. 15.

৮/২ বীরেশ গুহ স্ট্রীট, কলিকাতা-১৩

বিজ্ঞান সাধক জগদীশচন্দ্র / লেখা ও ছবি : দিলীপ দাস

খাদ্য ও পুষ্টি

মৃত্যুঞ্জয় প্রসাদ গুহ

বিপাক ঃ সাধারণ এক-কোষী প্রাণী থেকে মানুষ পর্যন্ত প্রায় সকল জাতের প্রাণীই হোলোজোইক (Holozoic) পদ্ধতিতে দেহের পুষ্টি সাধন (Nutrition) করে। এই পদ্ধতি জটিল এবং কঠিন জৈব খাদ্য গ্রহণ, পাচন, শোষণ এবং অপাচ্য অংশের বহিষ্করণ দ্বারা সম্পন্ন হয়। নিম্নশ্রেণীর কোন কোন প্রাণী অতি সরল ও তরল খাদ্য গ্রহণ ক'রে দেহের পুষ্টি সাধন করে। এর নাম স্যাপ্রোজোইক (Saprozoic) পুষ্টি।

প্রতিটি জীবিত কোষে কতকগুলি রাসায়নিক বিক্রিয়া অবিরত চক্রাকারে সম্পাদিত হচ্ছে; যেমন—নানাপ্রকার যৌগিক পদার্থ-গঠিত হচ্ছে কিংবা ভেঙ্গে যাচ্ছে, জারণ-প্রক্রিয়ায় শক্তি উৎপন্ন হচ্ছে, বিক্রিয়ার ফলে উৎপন্ন আবর্জনা পরিপার্শ্বের তরলে পরিত্যক্ত হচ্ছে, ইত্যাদি। এই সব পরিবর্তনকেই সামগ্রিকভাবে বিপাক (Metabolism) বলা হয়। খাদ্রব্যের গ্রহণ, পরিপাক ও শোষণের উপরেই এটি প্রধানতঃ নির্ভর করে। বিপাক সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করলে আমরা বুঝতে পারি, ভুক্তদ্রব্য দেহের মধ্যে প্রবেশ করার পর তার কি কি পরিবর্তন সাধিত হয়, এবং তার শেষ পরিণতি কি হয়।

বিপাক নির্ভর করে প্রধানতঃ কয়েকটি প্রাণ-রাসায়নিক বিক্রিয়ার উপর। আর তাতে সহায়তা করে আমাদের দেহ-নিঃসৃত নানাপ্রকার এনজাইম (Enzyme) বা উৎসেচক। এগুলি অত্যন্ত জটিল প্রোটিন জাতীয় জৈব প্রভাবক (বা. অনুঘটক) (catalyst)। এরা বিপাক-সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যকলাপ অত্যন্ত সুষ্ঠুভাবে নিয়ন্ত্রণ করে কিন্তু নিজেরা অপরিবর্তিত থাকে। উল্লেখ্য যে, একটি নির্দিষ্ট উৎসেচক একটি নির্দিষ্ট রাসায়নিক পদার্থ বা বিক্রিয়কের উপরেই ক্রিয়া করতে এবং তার পরিবর্তন ঘটাতে পারে। এদের মধ্যে যেন রয়েছে তালা-চাবির সম্পর্ক—একটি তালায় একটি মাত্র চাবিই লাগে, অন্য চাবি দিয়ে ওই তালা খোলা বা বন্ধ করা যায় না, এ-ও সেই রকম।

মানুষের বেলায় নিম্নলিখিত চারটি প্রক্রিয়া বিপাকের অন্তর্ভুক্ত।

(১) **খাদ্য-গ্রহণ** (Ingestion)—খাদ্যের প্রয়োজন হলেই আমাদের খিদে পায়, এবং খাদ্যের আকাঙ্ক্ষা জাগে। ভাল খাবারের কথা মনে হলেই, কিংবা তার সুগন্ধ নাকে গেলেই, জিভে জল আসে। আর সুস্বাদু খাবার মুখে দিলে তো কথাই নেই, সঙ্গে সঙ্গে প্রচুর লালা ক্ষরণ হয় এবং তা খাদ্যের সঙ্গে মিশে যায়।

খাদ্যদ্রব্য প্রথমে মুখে গ্রহণ করা হয়। সেখানে বিভিন্ন রকম দন্ত বা দাঁতের সাহায্যে তার কর্তন, ছেদন, চর্বণ ও পেষণ-ক্রিয়া সম্পাদিত হয়। এর ফলে তা ক্রমশঃ সূক্ষ্ম হয় এবং লালার সঙ্গে ভাল ক'রে মেশে। জিভ ঘুরে-ফিরে খাদ্যদ্রব্য বারবার বিভিন্ন দাঁতের কাছে নিয়ে গিয়ে এ কাজে বিশেষ ভাবে সহায়তা করে। বলা বাহুল্য, খাদ্যদ্রব্য যত সূক্ষ্মাংশে বিভক্ত হয়, তার উপর বিভিন্ন জারক-রসের ক্রিয়া তত সহজে সম্পাদিত হয়। মুখে তিন জোড়া লালা-গ্রন্থি আছে; যেমন—প্যারটিড, সাব-ম্যাক্সিলারী এবং সাব-লিঙ্গুয়াল। জিহ্বাদ্বারা স্বাদ গ্রহণ-মাত্র লালা নিঃসৃত হতে থাকে। প্যারটিডের পাতলা রস শুষ্ক খাদ্যকে নরম করে। আর সাব-ম্যাক্সিলারী ও সাব-লিঙ্গুয়ালের আঠালো রস (mucia) চর্বিত খাদ্যকে পিচ্ছিল করে বলে আমরা সহজেই তা গিলতে পারি।

মুখ-গহ্বরের পিছন থেকে দু'টো নালী নীচের দিকে নেমে গেছে—সামনে আছে শ্বাসনালী, আর পিছনে রয়েছে গ্রাসনালী। আল-জিহ্বা ও অধি-জিহ্বা দু'টো ঢাকনির মতো কাজ করে এবং ঐ দুই পথে শ্বাস ও খাদ্য চলাচল নিয়ন্ত্রণ করে। অন্যমনস্ক হলে, খাদ্য শ্বাসনালীতে চলে যায়। তখন বিষম লাগে।

(২) **পরিপাক-ক্রিয়া** (Digestion)—খাদ্যদ্রব্য মুখ থেকে গলবিল হয়ে গ্রাসনালীর ভিতর দিয়ে পাকস্থলীতে যায়, এবং সেখান থেকে যায় ক্ষুদ্রান্ত্রে। বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন রকম জারক-রস নিঃসৃত হয়। তাছাড়া পাকস্থলী এবং ক্ষুদ্রান্ত্র ছন্দোবদ্ধভাবে আন্দোলিত হতে থাকে, এতে খাদ্যদ্রব্য জারক-রসের সঙ্গে ভালভাবে মিশে যেতে পারে।

মুখ থেকেই খাদ্যের পরিপাক-ক্রিয়া আরম্ভ হয়। লালার মধ্যে থাকে টায়ালিন (ptyalin) ও মল্টেজ (Maltase) নামক দু'টি উৎসেচক। টায়ালিন সিদ্ধ শ্বেতসারের (boiled starch) পরিপাক ঘটায় এবং তাকে মল্টোজে পরিণত করে। আর মল্টেজের সাহায্যে কিছুটা মল্টোজ গ্লুকোজে পরিণত হয়।

পাকস্থলীতে নিঃসৃত হয় পাচক-রস (Gastric juice)। এর মধ্যে থাকে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড এবং পেপ্‌সিন (Pepsin) ও রেনিন (Rennin) নামক

উৎসেচক। হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড সুক্রোজের (বা, ইক্ষু-শর্করার) জল-বিশ্লেষণ (Hydrolysis) ঘটায়, এবং এইভাবে তার পরিপাকে সহায়তা করে। তাছাড়া হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড এবং পেপ্‌সিনের ক্রিয়ায় প্রোটিন পাচিত হয়ে পেপ্‌টোনে পরিণত হয়।

এদিকে ক্ষুদ্রান্ত্রে নিঃসৃত হয় পিত্তরস (Bile), অগ্ন্যাশয়-রস (Pancreatic juice) ও আন্ত্রিক রস (Intestinal juice)। অগ্ন্যাশয়-রসে থাকে অ্যামাইলেজ (Amylase), ট্রিপ্‌সিন (Trypsin) ও লাইপেজ (Lipase) নামক উৎসেচক। আর আন্ত্রিক রসে থাকে ইরেপ্‌সিন (Erepsin), সুক্রেজ (Sucrase) ল্যাক্‌টেজ (Lactase), এবং মল্টেজ (Maltase) নামক উৎসেচক। বিভিন্ন উৎসেচকের ক্রিয়ায় খাদ্যদ্রব্য ক্রমশঃ জীর্ণ হতে থাকে।

যকৃত-নিঃসৃত পিত্ত অম্লধর্মী পাকমণ্ডের অম্লভাব নষ্ট করে এবং ক্ষুদ্রান্ত্রে বিভিন্ন উৎসেচকের ক্রিয়া সার্থক করে তোলার জন্য প্রয়োজনীয় ক্ষারীয় মাধ্যম সৃষ্টি করে। তাছাড়া পিত্ত খাদ্যের স্নেহ-পদার্থের সঙ্গে মিশে একটি ইমালশন (Emulsion) বা অবদ্রব প্রস্তুত করে। এর উপরে লাইপেজ সহজেই ক্রিয়া করে, এবং তাকে গ্লিসারল এবং স্নেহজ অ্যাসিডে পরিণত করে। সূক্ষ্মাংশে বিভক্ত এবং লালার সঙ্গে মিশ্রিত খাদ্যের পরিপাক-ক্রিয়া শুরু হয় মুখ-বিবরে, পাকস্থলীতে গিয়ে তা আরও অগ্রসর হয়, এবং সম্পূর্ণ হয় ক্ষুদ্রান্ত্রে গিয়ে।

পাকস্থলীতে অবস্থানকালে খাদ্যদ্রব্য যে অর্ধজীর্ণ ও অর্ধ-তরল খাদ্যবস্তুতে পরিণত হয়, তাকে কাইম (chyme) বা পাকমণ্ড বলে। আর পাকমণ্ড ক্ষুদ্রান্ত্রে গিয়ে আরও জীর্ণ হয়ে যে খাদ্যরসে পরিণত হয়, তাকে কাইল (chyle) বলা হয়। বিভিন্ন স্থানে নানাপ্রকার উৎসেচকের সাহায্যে যেসব বিক্রিয়া সম্পাদিত হয়, সেগুলি প্রকৃতপক্ষে জল-বিশ্লেষণ (Hydrolysis) ছাড়া আর কিছুই নয়; যেমন—

(a)
$$\underset{\text{স্টার্চ}}{2\,(C_6H_{10}O_5)_n} \xrightarrow[\text{(টায়ালিন)}]{+\,nH_2O} \underset{\text{মল্টোজ}}{nC_{12}H_{22}O_{11}}$$
$$\xrightarrow[\text{(মল্টেজ)}]{+\,nH_2O} \underset{\text{গ্লুকোজ}}{2nC_6H_{12}O_6}$$

(b)
$$\underset{\text{প্রোটিন}}{H_2N.\overset{R}{C}H.CO.NH.\overset{R'}{C}H.CO.NH.\overset{R''}{C}H.CO\ldots} \xrightarrow[\text{(উৎসেচক)}]{+\,H_2O}$$

(পেপ্‌সিন, রেনিন, ট্রিপ্‌সিন, ইরেপ্‌সিন ইত্যাদি)

$$H_2N.\overset{R}{C}H.COOH + H_2N.\overset{R'}{C}H.COOH + H_2N.\overset{R''}{C}H.COOH + \text{ইত্যাদি}$$

নানাপ্রকার অ্যামিনো-অ্যাসিড

(c)
$$\underset{\text{স্নেহ-পদার্থ}}{\begin{array}{l} CH_2O.CO.R \\ CHO.CO.R' \\ CH_2O.CO.R'' \end{array}} \xrightarrow[\text{(উৎসেচক)}]{+\,3\,H_2O}$$

$$\underset{\text{গ্লিসারল}}{\begin{array}{l} CH_2OH \\ CHOH \\ CH_2OH \end{array}} \begin{array}{l} +\ R.\ COOH \\ +\ R'.\ COOH \\ +\ R''.\ COOH \end{array}$$

স্নেহজ অ্যাসিড

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে বোঝা গেল যে, পরিপাক ক্রিয়া সম্পূর্ণ হলে নিম্নলিখিত পরিবর্তনগুলি সম্পাদিত হয়—

(a) স্টার্চ (কার্বোহাইড্রেট) সরলতম শর্করা গ্লুকোজে পরিণত হয়; (b) প্রোটিন নানাপ্রকার অ্যামিনো-অ্যাসিডে পরিণত হয়; এবং (c) স্নেহ-পদার্থ গ্লিসারল ও নানাপ্রকার স্নেহজ অ্যাসিডে পরিণত হয়।

(৩) **অবশোষণ** (Absorption)—জীর্ণ খাদ্যের সারাংশ ক্ষুদ্রান্ত্রের সাহায্যে অবশোষিত হয়। ক্ষুদ্রান্ত্রের ভিতরের আবরণে অসংখ্য সূক্ষ্ম শুঁয়ার মতো শোষক-যন্ত্র (Villi) আছে। সরল শর্করা এবং অ্যামিনো-অ্যাসিডগুলি সোজাসুজি শোষক-যন্ত্রের মধ্যে অবস্থিত নাড়ী-জালকে (Capillaries) প্রবেশ করে। স্নেহ-পদার্থ জীর্ণ হলে স্নেহজ অ্যাসিডগুলি যকৃত-নিঃসৃত পিত্তের সাহায্যে ইমালসনে (বা, অবদ্রবে) পরিণত হয় এবং নাড়ী-জালকের মধ্যে গৃহীত হয়। এগুলি আবার গ্লিসারলের সঙ্গে মিলিত হয়, এবং তার ফলে পুনরায় নানাপ্রকার স্নেহ-পদার্থ সংশ্লেষিত হয়। স্নেহ-পদার্থের কিছু অংশ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্নেহকণা (droplets of fat) রূপে ল্যাক্টিয়েলের

মধ্যে প্রবেশ করে। এগুলি সেখান থেকে লসিকা-নালীর (Lymphatic vessels) ভিতর দিয়ে গিয়ে শেষে শিরার (veins) মধ্যে প্রবেশ করে।

খাদ্যের সারাংশ, বা দ্রবীভূত অংশ, শোষিত হয়ে রক্ত মধ্যে গৃহীত হয় এবং রক্তস্রোতের সঙ্গে দেহের কোষে-কোষে পৌঁছায়। সেখানে খাদ্যরস প্রোটোপ্লাজমের অঙ্গীভূত হয়। এর নাম আত্তীকরণ (Assimilation)।

(৪) **অপাচ্য অংশের বহিষ্করণ** (Egestion)—খাদ্যদ্রব্য পাচিত ও শোষিত হওয়ার পর কিছু অংশ অপাচিত থেকে যায়। এই অংশ বৃহদন্ত্র প্রবেশ ক'রে, তার বিভিন্ন অংশ অতিক্রম কালে, এ থেকে লবণ ও জলীয় অংশ অবশোষিত হয়। বাকি অংশ দেহের বাইরে পরিত্যক্ত হয়। বৃহদন্ত্রে কোন জারক-রস নিঃসৃত হয় না, এবং কোন পরিপাক-ক্রিয়া হয় না। খাদ্যের অজীর্ণ অংশ (মল) বৃহদন্ত্রের ভিতর দিয়ে গিয়ে সাময়িকভাবে মলাশয়ে সঞ্চিত হয়। তারপর মলাশয়ের পেশী-প্রাচীরের সঙ্কোচন ও প্রসারণের ফলে এই মল মলনালী হয়ে পায়ু-ছিদ্র দিয়ে দেহের বাইরে নিক্ষিপ্ত হয়। প্রতিদিন নিয়মিতভাবে মল-ত্যাগ করা কর্তব্য। নতুবা কোষ্ঠবদ্ধতা (constipation), পেটে বায়ু হওয়া, পেট-ব্যথা, ক্ষুধা-মান্দ্য প্রভৃতি রোগ হতে পারে।

[বিশেষ দ্রষ্টব্য—স্টার্চ আমাদের খাদ্য, কিন্তু সেলুলোজ নয়, যদিও উভয় প্রকার পদার্থই বহু-সংখ্যক গ্লুকোজ অণুর সমবায়ে গঠিত। এর প্রধান কারণ, আমাদের পাকস্থলীতে সেলুলোজ জীর্ণ করার উপযোগী উৎসেচক উৎপন্ন হয় না।

অপরদিকে, সেলুলোজ হ'ল তৃণভোজী প্রাণীদের প্রধান খাদ্য ; তৃণভোজী প্রাণীরা যে সেলুলোজও হজম করতে পারে, তার কারণ, তাদের পৌষ্টিক নালীতে এমন ব্যাকটিরিয়া বাস করে, যা প্রয়োজনীয় উৎসেচক Cellulase উৎপন্ন করে। উইপোকার পৌষ্টিক নালীতে সেলুলোজ জীর্ণ করার উপযোগী উৎসেচক এমনিই উৎপন্ন হয়। তাই কাঠ, কাগজ, কাপড়, ইত্যাদি উইপোকার স্বাভাবিক খাদ্য।]

বিপাকের ফল—বিপাকের ফলে আমরা দেহের উত্তাপ বজায় রাখার জন্যে, এবং পেশীর সাহায্যে কাজকর্ম করার জন্যে, প্রয়োজনীয় শক্তি পাই। আর পাই দেহের ক্ষয়পূরণ, গঠন এবং বৃদ্ধির জন্যে প্রয়োজনীয় সব উপাদান। তাছাড়া এর ফলেই দেহের বিভিন্ন অংশে জীবনী-শক্তির সঞ্চার হয়। কার্বোহাইড্রেট এবং ফ্যাট (বা, স্নেহ-পদার্থ) হ'ল শারীরিক শক্তির প্রধান উৎস। আর প্রোটিন থেকেই পাওয়া যায় দেহের ক্ষয়-পূরণ এবং বৃদ্ধির জন্যে প্রয়োজনীয় উপাদান সমূহ। তবে প্রোটিন উদ্বৃত্ত হলে, তা শক্তি-উৎপাদনের জন্যেও ব্যবহৃত হতে পারে। উল্লেখ্য যে- ১ গ্রাম কার্বোহাইড্রেট অথবা প্রোটিন-জাতীয় খাদ্য থেকে প্রায় ৪ বৃহৎ ক্যালরি, ১ গ্রাম ফ্যাট (বা, স্নেহ-পদার্থ) থেকে প্রায় ৯ বৃহৎ ক্যালরি, তাপ উৎপন্ন হয়।

বিপাকের পরিণতি প্রধানতঃ দু'রকম হয় ; যেমন—(১) ধ্বংসাত্মক, এবং (২) গঠনাত্মক।

পৌষ্টিক নালীতে কার্বোহাইড্রেট জাতীয় খাদ্য গ্লুকোজ, ফ্রুকটোজ, গ্যালাকটোজ প্রভৃতি মনোস্যাকারাইডে পরিণত হয়ে তারপর রক্তে শোষিত হয়, এবং রক্তস্রোতের সঙ্গে দেহের কোষে-কোষে পৌঁছায়। পরে অক্সিজেন-সংস্পর্শে এবং নানারকম উৎসেচকের সহায়তায় এদের মৃদু-দহন-ক্রিয়া (Slow oxidation) সম্পাদিত হয়। এর ফলে জল, কার্বন ডাই-অক্সাইড এবং শক্তি উৎপন্ন হয়। এই শক্তি আমাদের শারীরবৃত্তীয় কাজে ব্যবহৃত হয়। একে অপচিতি-ক্রিয়া (Catabolism) বলা হয়।

পক্ষান্তরে দেহের উদ্বৃত্ত শর্করা যকৃতে (Liver) ও পেশীতে (Muscle) গিয়ে প্রধানতঃ গ্লাইকোজেনে পরিণত হয়, এবং ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চিত থাকে। এর নাম গ্লাইকোজেনেসিস্ (Glycogenesis)। এছাড়া উদ্বৃত্ত শর্করা থেকে কিছুটা মেদ বা চর্বি উৎপন্ন হয়, এবং তা মেদ কলায় সঞ্চিত হয়। সাধারণভাবে এসব উপচিতি-ক্রিয়া (Anabolism)।

উল্লেখ্য যে, রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা কমে গেলে, বিভিন্ন উৎসেচকের ক্রিয়ায়, গ্লাইকোজেন ভেঙ্গে আবার গ্লুকোজে পরিণত হয়, এবং জারিত হয়ে শক্তি প্রদান করে। এর নাম গ্লাইকোজেনোলাইসিস্ (Glycogenolysis)।

রক্তের প্রধান শর্করা গ্লুকোজ। সেজন্য সাধারণভাবে একেই রক্ত-শর্করা (blood-sugar) বলা হয়। এর স্বাভাবিক পরিমাণ, প্রতি ১০০ মিলিলিটার রক্তে ৮০-১২০ মিলিগ্রাম। উপবাসকালে এর পরিমাণ ৮০-১০০ মিলিগ্রাম থাকে, কিন্তু খাওয়ার পর এর পরিমাণ বেড়ে ১২০ মিলিগ্রাম পর্যন্ত হয়। সাধারণ সুস্থ মানুষের রক্ত-শর্করা কখনও এর চেয়ে বেশী হয় না।

অগ্ন্যাশয় থেকে নিঃসৃত হরমোন ইন্‌সুলিন (Insulin) কার্বোহাইড্রেট-বিপাককে বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রণ করে। এরই সহায়তায় উদ্বৃত্ত গ্লুকোজ যকৃতে এবং পেশীতে গিয়ে গ্লাইকোজেনে পরিণত হয়। ইন্‌সুলিনের ঘাটতি হলে, রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা বৃদ্ধি পায়।

রক্ত-শর্করার পরিমাণ ১৮০ মিলিগ্রামের বেশী হলে,

মূত্রের সঙ্গে এই শর্করা নির্গত হয়। এর নাম গ্লাইকো-সুরিয়া (Glycosuria) ডায়াবেটিস মেলিটাস (Diabetes mellitus) বা মধুমেহ রোগে এইরকম উপসর্গ দেখা দেয়।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, আর একটি হরমোন (অ্যাড্রিন্যালিন) প্রয়োজন মত সঞ্চিত গ্লাইকোজেনকে দ্রবণীয় গ্লুকোজে পরিণত করতে সাহায্য করে।

কোষের মধ্যে অ্যামিনো-অ্যাসিড অণুগুলি থেকে নানাপ্রকার প্রোটিন সংশ্লেষিত হয়। এইভাবে ক্রমশঃ জটিল থেকে জটিলতর এবং বৃহত্তর প্রোটিন অণু সংশ্লেষিত হয়, এবং তা থেকে জটিল দেহতন্তু গড়ে ওঠে। এইসব প্রোটিন দেহের ক্ষয়-পূরণে এবং বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। অ্যামিনো-অ্যাসিড নানাপ্রকার হরমোন ও উৎসেচক উৎপাদনেও সহায়তা করে। আবার, এ থেকে শক্তিও পাওয়া যায়।

অ্যামিনো-অ্যাসিডের উদ্বৃত্ত অংশ যকৃতে গিয়ে ডিঅ্যামিনেশন-প্রক্রিয়ায় (Deamination) ইউরিয়া ও গ্লাইকোজেনে রূপান্তরিত হয়। ইউরিয়া রক্ত-প্রবাহের সঙ্গে বৃক্কে (Kidney) পৌঁছালে, সেখানে মূত্রের সঙ্গে পরিত্যক্ত হয়। আর গ্লাইকোজেন ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চিত থাকে। প্রয়োজন হলে তা থেকে শক্তি উৎপন্ন হয়।

পূর্বেই বলা হয়েছে যে, অবশোষণের পর গ্লিসারল ও স্নেহজ অ্যাসিড পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হয়ে নানা-প্রকার স্নেহ-পদার্থ সংশ্লেষণ করে। এই স্নেহ-পদার্থ দেহকোষ গঠনে অংশগ্রহণ করে এবং দেহের সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করে। স্নেহ-পদার্থ যকৃতে গিয়ে পুনরায় ভেঙ্গে গ্লিসারল ও স্নেহজ অ্যাসিডে পরিণত হয়। সেগুলি কোষে-কোষে গিয়ে অক্সিজেন দ্বারা জারিত হয়। তাই এভাবেও অনেক শক্তি উৎপন্ন হয়। উদ্বৃত্ত স্নেহ-পদার্থ মেদ বা চর্বিরূপে চামড়ার নীচে এবং উদর-গহ্বরে মেদ-কলায় (Adipose tissues) সঞ্চিত থাকে। এই স্নেহ-পদার্থ দেহের তাপ-সংরক্ষণে সহায়তা করে এবং দেহকে সুডৌল করে দেহের সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করে। তাছাড়া অনশনকালে (অর্থাৎ, উপবাসের সময়) তা থেকে শক্তি পাওয়া যায়।

মৌল-বিপাক—খাদ্য গ্রহণের ১২-১৮ ঘণ্টা পরে স্বাভাবিক পারিপার্শ্বিক উষ্ণতা, চাপ ও আর্দ্রতার মধ্যে, শারীরিক ও মানসিক ভাবে সম্পূর্ণ বিশ্রামরত এবং শায়িত অবস্থায়, বিপাকীয় কার্যের ফলে যে পরিমাণ শক্তি উৎপন্ন হয় (অর্থাৎ, দেহের ন্যূনতম কাজকর্ম চালু রাখার জন্যে যতটা বিপাক প্রয়োজন হয়), তাকে **বেসাল মেটাবলিক রেট** (Basal Metabolic Rate, সংক্ষেপে B. M. R) বা **মৌল-বিপাক** বলা হয়। এইসময় কতটা অক্সিজেন গৃহীত হয়, তা থেকেই মৌল-বিপাক (B. M. R.) হিসেব ক'রে বের করা হয়। একজন পূর্ণবয়স্ক পুরুষের মৌল বিপাক দৈনিক প্রায় ১,৬০০ ক্যালরি। স্ত্রীলোকের কিছু কম।

বৃদ্ধি—বৃদ্ধি (Growth) হ'ল সজীব বস্তুর একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। বিপাকের সময় জীবদেহের ক্ষয় ও গঠন যুগপৎ চলে। যখন গঠনাত্মক প্রক্রিয়ার হার ধ্বংসাত্মক প্রক্রিয়ার চেয়ে বেশী হয়, তখনই জীবদেহের বৃদ্ধি সম্ভবপর হয়। এর ফলে জীবদেহের আয়তন-বৃদ্ধি এবং আকৃতির পরিবর্তন ঘটে। এর মূলে আছে সুষম খাদ্য গ্রহণ, এবং তার সুষ্ঠু বিপাক-সাধন। প্রয়োজনীয় সবগুলি উপাদান পরিমাণ মত পাওয়া গেলে, এবং সব-রকম পাচকরস ও হরমোনের সরবরাহ অক্ষুণ্ণ থাকলে, দেহের স্বাভাবিক পুষ্টি ও বৃদ্ধি অব্যাহত থাকে। কারণ, তখন জৈব-রাসায়নিক বিক্রিয়াগুলি ঠিক-ঠিক মত সম্পাদিত হয়। এর ফলে প্রয়োজনীয় শক্তি উৎপন্ন হয়, এবং নতুন প্রোটোপ্লাজ্‌মের সৃষ্টি হয়। তাতে কোষের আয়তন বৃদ্ধি পায় এবং নতুন নতুন কোষ উৎপন্ন হয় বলে জীবদেহ বৃদ্ধি পায়।

অল্প বয়সে অপচিতির তুলনায় উপচিতি বেশী হয়। এজন্য বালক-বালিকারা দ্রুত আকারে বৃদ্ধি পায়। মধ্য বয়সে উপচিতি এবং অপচিতি প্রায় সমানভাবে চলে, এজন্য তখন বৃদ্ধি প্রায় স্তব্ধ হয়ে যায়। কিন্তু বৃদ্ধ বয়সে অপচিতির হার বেশী হয়ে যায়। তাই ক্রমশঃ ঘনিয়ে আসে জরা, তারপর মৃত্যু।

৭৭/১, ইন্দ্র বিশ্বাস রোড, ফ্ল্যাট নং ২, কলিকাতা-৩৭

মাটি থেকে আকাশে

পার্থসারথি চক্রবর্তী

নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে বৈমানিক ও বিমানযাত্রীদের রক্ষা করে যে জিনিস তার নাম প্যারাসুট বা লাইফ বেল্ট-অব-এয়ার। জাহাজডুবি হলে যেমন যাত্রীরা লাইফ বেল্ট-এর সাহায্যে জীবন বাঁচায় ঠিক তেমনি আকাশ পথে কোনও দুর্ঘটনা ঘটলে বিমানযাত্রীরা প্যারাসুটের সাহায্যে প্রাণ রক্ষা করে। লাইফ বেল্ট দেখতে গোল—অনেকটা মোটর গাড়ীর চাকার টিউবের মতো। বাতাস ভর্তি এই টিউবের উপর ভর দিয়ে বিপন্ন যাত্রীরা জলে ভেসে থাকে। প্যারাসুট কিন্তু আকাশে ভেসে থাকে না। ধীরে ধীরে আরোহীকে নিয়ে মাটিতে নেমে আসে। আকাশ থেকে প্যারাসুটের সাহায্যে ঝাঁপ মারা খুব সহজ ব্যাপার নয়। এর জন্যে অনেকদিন ধরে কায়দাকানুন শিখতে হয়।

যুদ্ধের সময় বিমানকে প্রায়ই দুর্ঘটনার কবলে পড়তে দেখা যায়। তখন বৈমানিকের বাঁচার একমাত্র অবলম্বনই হ'ল প্যারাসুট। প্যারাসুট আবিষ্কৃত না হ'লে এইসব বৈমানিকদের জীবনের কি অবস্থা হোত তা আমরা কল্পনা করতেও পারি না।

ইংল্যাণ্ডের বিখ্যাত প্যারাসুট ব্যবসায়ী ছিল আর্ভিং কোম্পানী। তারা একটা ক্লাব তৈরী করেছিল--'ক্যাটার পিলার ক্লাব'। এই ক্লাবের উদ্দেশ্য ছিল নবীন পাইলটদের প্যারাসুটের সাহায্যে ঝাঁপ দিতে নিপুণ করে তোলা।

প্যারাসুটের ছবি তোমরা অনেকেই হয়ত দেখেছ। এটা দেখতে ছাতির মতো—তবে অনেক বড়। প্যারাসুট তৈরী করা হয় পাতলা শক্ত সিল্ক দিয়ে। ক্যাটার পিলারের অর্থ হচ্ছে—রেশমী পোকা। ছোট্ট রেশমী পোকার উপর পাইলটের জীবন নির্ভর করে—তাই ইংল্যাণ্ডের 'ক্যাটার পিলার ক্লাবের' প্রতীক ছিল এই রেশমী পোকা। ক্লাবের সভ্যদের বুকে আটকানো থাকত এই রকম একটা ব্যাজ।

প্যারাসুটের বাইরের দিকে অনেকগুলো দড়ি ঝুলতে থাকে। এই দড়িগুলো নীচের দিকে এসে একজায়গায় জড়ো হয়েছে। বিমান থেকে প্যারাসুটে যে লাফ মারে সে এই জায়গাটাতে বাঁধা থাকে। প্যারাসুটের বাইরের দড়ি খুলে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গোল সিল্কের ছাতায় বাতাস ঢুকে তার মুখটা ভর্তি করে দেয়। বাতাস তখন আরোহীসুদ্ধ প্যারাসুটকে উপরে তোলার চেষ্টা করে। কিন্তু মাধ্যাকর্ষণের টানে প্যারাসুট তার বাহককে নিয়ে আস্তে আস্তে নীচে নেমে আসে বাতাসে ভাসতে ভাসতে। ভারী মজার ব্যাপার—তাই না?

যুদ্ধে এইসব বিমান ব্যবহৃত হয়।

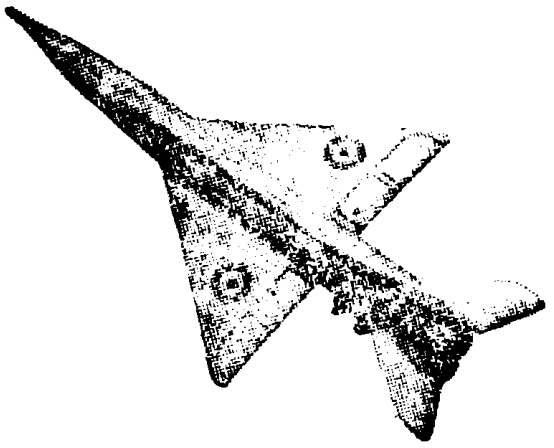

মিগ

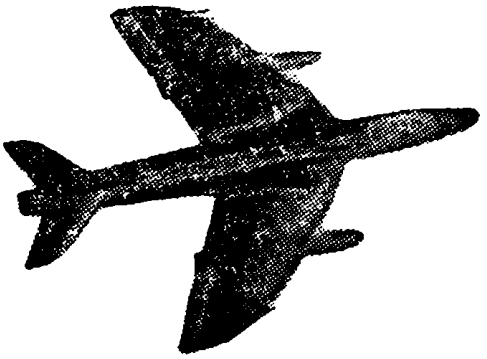

হাণ্টার

স্যাট

মহাযুদ্ধই বলতে গেলে প্যারাসুটকে শিরোনামায় নিয়ে আসে। এর আগে অবশ্য বেলুন থেকে প্যারাসুট পরে অনেকে লাফ দিয়েছে—কিন্তু তা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসরণ করে নয়। মহাযুদ্ধের সময় যোদ্ধা এবং বৈমানিকরা পরিষ্কার বুঝতে পারল যে তাদের বেঁচে থাকতে প্যারাসুট অনেকাংশে সাহায্য করতে পারে। কারণ যখন শত্রুপক্ষের বিমান

এসে গুলিবর্ষণ করে অথবা বোমাবাজি করে পালিয়ে যেত তখন বৈমানিকদের লাফানো ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। প্যারাসুটের উপর নির্ভর করেই তখন অভিজ্ঞ বৈমানিক নির্ভয়ে মাটিতে লাফ মারতো। জার্মান বৈমানিকেরা জ্বলন্ত এরোপ্লেন থেকে ঝাঁপ দেবার ব্যাপারে অতিশয় দক্ষ ছিল। যুদ্ধক্ষেত্রে প্যারাসুটের সাহায্যে হাজার হাজার সৈনিকও প্রয়োজন মত স্থানে নামান হয়েছে। এদের বলে প্যারাট্রুপস (Paratroops)। এই প্যারাট্রুপস বাহিনী খুবই দুঃসাহসিক কাজ করে থাকে, সন্দেহ নেই।

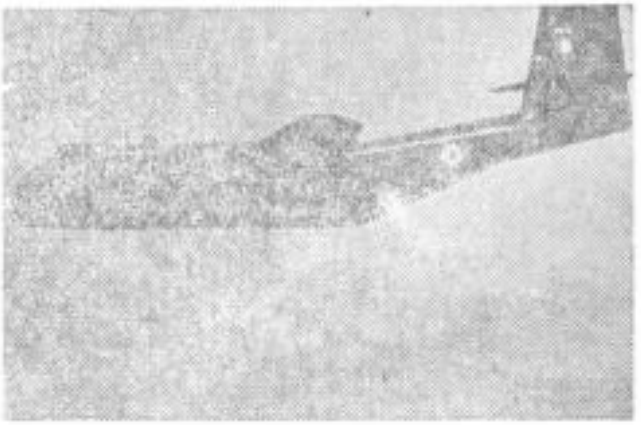

বিশেষ ধরণের রণী বিমান

যখন সবাই বুঝল প্যারাসুট ছাড়া আকাশ-যাত্রা নিরাপদ নয়—তখনই শুরু হয়ে গেল প্যারাসুট নিয়ে ব্যাপক গবেষণা। প্যারাসুটের উন্নতি হ'ল অনেক। প্যারাসুট ভাঁজ করা অবস্থায় বৈমানিকের পিঠে আটকানো থাকে। ককপিটে বসলে এটা তার আরাম বালিশের মতো কাজ করে।

এরোপ্লেন থেকে লাফ মারার সাথে সাথে বৈমানিক একটা দড়ি টেনে প্যারাসুটের মুখ খুলে দেয়। এর নাম—'রিপ কর্ড'। মুখ খোলার সাথে সাথে প্যারাসুট উড়তে থাকে ও আরোহীকে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করে। এখানে আর একটা কথা বলা প্রয়োজন। অভিজ্ঞ বৈমানিকেরা এরোপ্লেন থেকে ঝাঁপ মারার সাথে সাথেই 'রিপ-কর্ড' খোলার চেষ্টা করেন না। এতে দুর্ঘটনার সম্ভাবনা থাকে। ঝাঁপ মারার কয়েক সেকেণ্ড পর ওটা খুলতে হয়।

প্যারাসুট নিয়ে এরোপ্লেন থেকে মাটিতে নামা নিয়ে অনেক রোমাঞ্চকর ঘটনা রয়েছে। প্যারাসুট আরোহীদের সত্যিকার অভিজ্ঞতার কাহিনী পড়লে উত্তেজনায় গা শিউরে ওঠে।

জন ট্রানাম ছিলেন এইরকম অতি বড় দক্ষ প্যারাসুট আরোহী। তাঁর সাহস ও দক্ষতার তুলনা মেলা ভার। এখনও প্যারাসুট অভিযাত্রীদের সামনে জন ট্রানামের কথা উঠলে সকলের মাথা শ্রদ্ধায় নত হয়ে আসে। ট্রানামকে বলা হোত প্যারাসুট প্রিন্স।

ট্রানামের সময় অনেকে ভাবত দুর্ঘটনায় না পড়লে বৈমানিককে প্যারাসুট নিয়ে আকাশ থেকে লাফ মারবার প্রয়োজন হয় না। কিন্তু ট্রানাম ছিলেন একেবারে অন্য ধাতু দিয়ে গড়া। তাঁর কাছে জীবন ছিল 'পায়ের ভৃত্য—চিত্ত ভাবনাহীন'।

একবার এক বন্ধু ট্রানামকে তাঁর ছোট্ট গ্রামে নিমন্ত্রণ করেন। ট্রানাম সোজা পথে না গিয়ে এরোপ্লেন থেকে সুটকেশ হাতে করে প্যারাসুটের সাহায্যে ঐ গ্রামে লাফ দিলেন! ট্রানামের এই রকম কাণ্ড-কারখানা দেখে বন্ধু-বান্ধবেরা অবাক হয়ে যেত।

ট্রানাম একবার স্থির করলেন—অন্ধকার আকাশ থেকে দু'হাতে জ্বলন্ত মশাল নিয়ে মাটিতে নামবেন। এ কাজ করতে গিয়ে অবশ্য তাঁকে বেশ বিপদের সম্মুখীন হতে হয়েছিল। দৈবক্রমে সেবার তিনি অল্পের জন্য মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পান।

এক রেলব্রীজের উপর থেকে প্যারাসুট নিয়ে লাফ মেরে তিনি রেকর্ড করেছিলেন। ঐ ব্রীজটা ছিল নদীর তল থেকে মাত্র দেড়শ ফুট উঁচু।

প্যারাস্যুটের সাহায্যে অবতরন

ট্রানাম কুড়ি হাজার ফুট উপর থেকে লাফ দিয়ে মাত্র মাটির থেকে তিনি হাজার ফুট উপরে এসে প্যারাসুট খুলে আর এক নতুন রেকর্ড করেছিলেন।

যদিও ট্রানাম প্যারাসুট নিয়ে এই রকম আর একটা লাফ মারতে গিয়ে তাঁর প্রাণ হারান—তবু জন ট্রানামের নাম প্যারাসুটের সাথে চিরকাল অমর হয়ে থাকবে।

পুনর্মুদ্রণ

পিঁপড়েদের গোরু

জগদানন্দ রায়

আমরা গোরু পুষি এবং ঘাস খড় খাওয়াইয়া তাহাদিগকে যত্ন করি; তার পরে তাহারা বাচ্চা প্রসব করিয়া আমাদিগকে দুধ দেয়। পিঁপড়েরা দুধ খাইবার জন্য গোরুর মত করিয়া একরকম প্রাণীকে পোষে—কথাটা আশ্চর্য হইলেও সম্পূর্ণ সত্য। নাল্‌সো ও ডেঁয়ো পিঁপড়েদেরই গোরু-পোষা স্বভাব বেশি দেখা যায়।

বর্ষার এবং শীতের শেষে যে সবুজ রঙের ছোট পোকা প্রদীপের চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়ায় তোমরা তাহা বোধহয় দেখিয়াছ! কপি, গোলাপ, শসা, মূলা প্রভৃতি গাছের পাতাতে এই জাতীয় অনেক পোকা দেখা যায়। ইহাদের সকলেরই রঙ যে সবুজ হয়, তাহা নয়। এই জাতীয় মেটে ও কালো রঙের পোকাও দেখা যায়। অনেক জায়গায় এই পোকাকে জাব-পোকা বলে। নাল্‌সো পিঁপড়েরা প্রায়ই জাব-পোকার ডিম আনিয়া বাসায় পালন করে। আমরা যেমন গোরু পালন করি, ঠিক সেইরকম যত্নেই উহারা পোকা পালন করে। ডিম যাহাতে নষ্ট না হয়, ডিম ফুটিলে বাচ্চারা যাহাতে প্রচুর খাবার পায় এবং বাহির হইতে শত্রু আসিয়া যাহাতে ডিম নষ্ট না করে—এই সকল বিষয়ে পিঁপড়েদের খুব নজর থাকে। তাহারা কিসের জন্যে এত যত্ন ও চেষ্টা করিয়া পোকা পোষে, তাহা বোধহয় তোমরা এখনও বুঝিতে পার নাই। আমরা গোরুদিগকে খাওয়াইয়া যেমন ভাঁড়ে-ভাঁড়ে দুধ আদায় করিয়া লই, পিঁপড়েরাও ঐসব পোকাদের কাছ হইতে মধুর মত মিষ্টি এক রকম রস আদায় করিয়া লয়।

পিঁপড়েদের গোরুর প্রকৃত আকার এত ছোট যে, দশ বারোটিকে পরপর না সাজাইলে এক ইঞ্চি জায়গা জোড়া যায় না। ইহাদের সকলের ডানাগজায় না এবং পাগুলিও খুব লম্বা হয় না। এজন্য ইহারা তাড়াতাড়ি চলা-ফেরা করিতে পারে না। গাছের রসই ইহাদের প্রধান খাদ্য। তাই যে গাছে পিঁপড়ের গোরু বেশি থাকে, সেই গাছ প্রায়ই মরিয়া যায়।

পোকাটির পিছনে নলের মত দুইটি অংশ থাকে। এই দুইটি মধুর নল। গোরুর বাঁটে যেমন আপনা হইতেই অনেক দুধ জন্মে, পিঁপড়েদের গোরুর দেহের ঐ দুইটি নলে সেই রকমে আপনিই অনেক মধু জমা হয়। ফাল্গুন-চৈত্র মাসে আম গাছের পাতায় কখনো কখনো এক রকম চক্‌চকে মধু লাগিয়া থাকিতে দেখা যায়। এই মধুও এক রকম পতঙ্গের শরীর হইতে বাহির হয়। আমগাছের তলায় গেলে, এক রকম ছোট পোকাকে চড়্‌বড় শব্দ করিয়া এক পাতা হইতে লাফাইয়া অন্য পাতায় যাইতে দেখা যায়। এক-একটি আমগাছে বোধহয় লক্ষ লক্ষ পোকা থাকে। এইগুলিই শরীর হইতে মধু বাহির করিয়া গাছের পাতায় লাগায়। ইহারাও পিঁপড়েদের গোরু জাতীয় প্রাণী। তোমরা যদি পরীক্ষা কর, তবে দেখিতে পাইবে,—যে গাছে এই পোকা বেশি থাকে, সেখানে নানা জাতীয় পিঁপড়েও দিবারাত্রি ঘুরিয়া বেড়ায়।

দুধ সংগ্রহ করিতে হইলে আমরা গোরুকে দুহিয়া থাকি। পিঁপড়েরা জাব-পোকার মধু সংগ্রহ করিবার সময়ে বড় মজা করে। মধু খাইবার ইচ্ছা হইলেই তাহারা লম্বা শুঁড় দিয়া পোকাদের লেজের কাছে সুড়সুড়ি দিতে আরম্ভ করে। ইহাতে পোকাদের শরীর হইতে বিন্দু বিন্দু মধু বাহির হইতে থাকে। পিঁপড়েরা তাহাই পরমানন্দে চাটিয়া খাইতে থাকে। সুতরাং দেখা যাইতেছে, পিঁপড়েরা যে পোকাগুলিকে গোরুর মত পোষে তাহা নয়, আমরা যেমন গোরুর দুধ দুহিয়া লই, উহারাও সেইরকমে মধু দুহিয়া লয়।

নাল্‌সো পিঁপড়েরা জাব-পোকাগুলিকে অতি যত্নে পালন করে। যাহাতে সেগুলি পালাইতে না পারে, তাহার জন্য জাল বুনিয়া খোঁয়াড় তৈয়ারি করে। কখনো কখনো নিজেদের বাসাতেও পোকাগুলিকে আটকাইয়া রাখে। এই গোরু লইয়া এক দল পিঁপড়ের সহিত আর এক দলের প্রায়ই লড়াই বাধিয়া যায়।

ছোটদের দপ্তর

পরিচালক ঃ জয়ন্ত দত্ত

● তোমরা যারা কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞানের নিয়মিত পাঠক এবং স্কুলে পড়াশোনা করছ—'ছোটদের দপ্তরে' লেখা পাঠাতে পার। সম্পাদকমণ্ডলীর মনোনয়ন পেলে সে লেখা 'ছোটদের দপ্তরে ছাপা হবে। তবে শব্দ সংখ্যা কিছুতেই যেন ২০০-এর বেশী না হয়। সঙ্গে প্রয়োজন মতো ফটো বা আঁকা ছবি পাঠাবে।

● শুধু আমাদের প্রশ্নই নয়, তোমরাও ছোটদের দপ্তরে প্রশ্ন পাঠাতে পার। জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রশ্ন, পড়াশোনার প্রশ্ন, যার উত্তর আমরা পরবর্তী সংখ্যাগুলিতে প্রকাশ করব।

'বিজ্ঞান জিজ্ঞাসার' প্রশ্নের উত্তর চলতি মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে আমাদের দপ্তরে পৌঁছানো চাই

প্রশ্নের সংগে তোমরা নিজেদের বয়স কিন্তু উল্লেখ করবে।

তবে সব ক্ষেত্রেই চিঠি বা খামের উপরে ছোটদের দপ্তর' কথাটি উল্লেখ করতে হবে।

বিজ্ঞান-জিজ্ঞাসার ফেব্রুয়ারী সংখ্যার—দশ বা তার বেশী সঠিক উত্তরদাতাদের নাম।

১। পার্থপ্রতিম পাল—শেওড়াফুলি, হুগলী।
২। সন্দীপন মুখোপাধ্যায়—রাইমটাং চা বাগান কালচিনি, জলপাইগুড়ি।
৩। মনসিজ মুখোপাধ্যায়—ঐ
৪। প্রশান্ত কুমার মাল—গ্রাম ও পোঃ—পলাশপুর, হুগলী।
৫। কমলেশ সাহা—হুগলী।
৬। মণীন্দ্রনাথ পাত্র—১৬বি, হরলাল দাস স্ট্রীট কলিকাতা-১৪।
৭। অমিতাভ চ্যাটার্জী—স্বস্তি, শ্রীপল্লী, চন্দননগর হুগলী।
৮। গৌতমকুমার পাণ্ডা—৯/২, গোপীনাথ চোংদার লেন, হাওড়া-১।
৯। সেক কামরে হোসেন—গ্রাম ও পোঃ—চন্দ্রেশ্বরপুর মেদিনীপুর।
১০। বিবেকানন্দ সরকার—বহরমপুর (গোরাবাজার) মুর্শিদাবাদ।

প্রশ্ন-উত্তর

প্রঃ ১। কিশোর জ্ঞান বিজ্ঞানের তরফ থেকে যে রচনা প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা হয়েছে সেই রচনা পাঠাবার ঠিকানাটা অতি অবশ্যই যত তাড়াতাড়ি পাঠাবেন। ইহা আমার খুবই প্রয়োজন।

রাজীব মুখোপাধ্যায়,
সাহাপুর গভঃ হাউসিং এস্টেট
ব্লক—এ, ফ্ল্যাট-৫, কলকাতা-৩৮

উঃ রচনা প্রতিযোগিতায় রচনা পাঠাবার ঠিকানা কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞানেরই ঠিকানা, ৮/১এ, শ্যামাচরণ-দে স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০৭৩। নাম পাঠাবার জন্য ফর্মটি কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞানের গত কয়েকটি সংখ্যা এবং এবারের সংখ্যাতেও দেওয়া আছে। কাজেই তোমার রচনা পাঠাবার কোন অসুবিধা আর নিশ্চয়ই হবে না।

প্রঃ ২। আমি আপনার প্রকাশিত 'বিজ্ঞান-সংবাদ', 'লেখাপড়া' ও 'ছবিতে গল্প—পোষ্টারে বিজ্ঞান' পত্রিকা তিনটি পেতে চাই। অনুগ্রহ করে পাঠিয়ে দিবেন কি?

মোস্তাফা কামাল
হবিগঞ্জ সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়
হবিগঞ্জ, সিলেট, বাংলাদেশ।

উঃ উপরে উল্লিখিত তিনটি নামের আলাদা কোন বই নেই। কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান পত্রিকায় বিষয়বস্তুর মধ্যে যা যা থাকে এগুলি তারই অন্যতম। কাজেই কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান থেকেই তুমি তোমার আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে পারবে।

প্রঃ ৩। টি. ভি-র পর্দা ঢালু হয় কেন?
প্রদীপ মুখার্জী
দুর্গাপুর, বর্ধমান।

উঃ টি-ভির পিকচার টিউব-এর পিছনে থাকে একটি ইলেকট্রন নিক্ষেপকারী যন্ত্র যাকে বলে 'ইলেকট্রন গান্'। 'ইলেকট্রন গান্'—নিক্ষিপ্ত এক একটি ইলেকট্রন টি ভি-র ফ্লুরোসেন্ট পর্দার ওপর বিন্দুর আকারে এসে পড়ে ও পর্দার ওপর চলাচল করে। টেলিভিশন পর্দার প্রতিটি বিন্দু যদি ইলেকট্রন ক্ষেপণের বিন্দুটি থেকে সমদূরত্বে না থাকে তবে পর্দার ওপরে বিভিন্ন স্থানে পৌঁছবার পর ইলেকট্রন বিন্দুটির আকার পরিবর্তিত হবে ফলে ছবির বিকৃতি ঘটবে। এই কারণেই টি ভি পর্দাকে একটি গোলকের বক্র তলের আকৃতি দিয়ে এই বক্রতার কেন্দ্রে স্থাপন করা হয় ইলেকট্রন গান্।

জুপিটারের বার্তা

দেবাশিস দাস

প্রিয় প্রফেসর আচার্য,

প্রায় বারো ঘণ্টা আগে জুপিটার নিয়ে আমার দ্বিতীয় গবেষণামূলক পরীক্ষা শেষ হয়েছে। আমি কতটা সফল বা ব্যর্থ হয়েছি, তার হিসাব-নিকাশ করা হবে পরে; তার আগে আমার পরীক্ষার সংক্ষিপ্ত বিবরণ রাখছি।

জুপিটার নিয়ে আমার প্রথম গবেষণার মত এবারেরও উদ্দেশ্য ছিল, ঐ গ্রহে কোন প্রাণী আছে কিনা, তার প্রমাণ পাওয়া, আর থাকলে তাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতান যায় কিনা, তা দেখা। তবে, গতবার যে ভুল করেছিলাম, এবারে আর তার পুনরাবৃত্তি হতে দিই নি। পরীক্ষার যন্ত্রপাতির সুবন্দোবস্ত করেই কাজে নেমেছিলাম।

আমি কি ব্যবস্থা করেছিলাম, তা জানানোর আগে আর একটা বিষয় জানান দরকার—সেটা হল আমার তৈরী নতুন টিভি সেট। আমার পাঠান মহাকাশযান 'জু-২' থেকে পাঠান ছবি তো পর্দায় দেখা যাবেই, তার সঙ্গে সঙ্গে টিভির ভেতর লাগান একটা প্রজেক্টারে তা কপি হয়ে যাবে। প্রজেক্টারটা রাখা একটা প্রমাণ স্বরূপ। মহাকাশের প্রেরিত বার্তা শব্দগ্রাহক যন্ত্রে টেপ্ হবে আর সঙ্গে সঙ্গেই 'মিস্টার ট্রানস্লেটর' তা আমার বোধগম্য ভাষায় অনুবাদ করে দেবে। টিভির সঙ্গেই লাগানো আছে একটা ঘড়ি। আর রয়েছে চার রঙের চারটে আলো: লাল, নীল, সবুজ ও হলুদ; এগুলো বিভিন্ন ঘটনার প্রতীক।

'জু-২' যখন জুপিটারের মাটিতে ল্যাণ্ড করবে, তখন হলুদ আলো জ্বলে উঠবে। কোন প্রাণীর দেখা পেলে সবুজ, তাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে পারলে নীল আলো জ্বলবে; আর কোন অঘটন ঘটলে লাল আলোটা তা জানিয়ে দেবে।

'জু-২' কে প্রয়োজনে যাতে নির্দেশ দিতে পারি, তারও ব্যবস্থা ছিল। মোটামুটি এটাই ছিল আমার পরিকল্পনা মত কাজ।

গতকাল বিকেল ৫টা থেকে ল্যাবরেটরীতে টিভির পর্দায় চোখ রেখে বসে আছি। আমার হিসাব মত 'জু-২' ঠিক ৫টা বেজে ৪৭ মিনিট ৩৯ সেকেণ্ডে জুপিটারের মাটিতে ল্যাণ্ড করবে—ঐ সময়তেই পৃথিবীর সঙ্গে জুপিটারের দূরত্ব সবচেয়ে কম হবে। মিনিট সাতচল্লিশ হাতে সময় নিয়ে বসে আছি। মাঝে মাঝে ঘড়ির দিকে তাকাচ্ছি আর টেলিস্কোপে চোখ লাগাচ্ছি—ঠিক যেখানে জুপিটারের ওঠার কথা, সেখানটা দেখছি। একটা কি যেন ঘটতে চলেছে—তারই অপেক্ষা করছি।

এদিকে ইলেকট্রনিক্স ঘড়িতে সময় বয়ে চলেছে। সাড়ে পাঁচটা নাগাদ টেলিস্কোপে জুপিটার ধরা পড়ল—পাশেই রয়েছে লালচে স্যাটার্ন, একটু নিষ্প্রভ। আরো কিছু সময় কেটে গেল। ঘড়িতে ৫টা বেজে ৪৭ মিনিট। আর মাত্র কিছুক্ষণ···ক্ষণে ক্ষণে সেকেণ্ড পাল্টাচ্ছে··· পঁয়ত্রিশ···ছত্রিশ···সাঁইত্রিশ···আটত্রিশ···উনচল্লিশ···

টিভির পর্দায় কোন ছবির দেখা নেই! কি ব্যাপার! কোথাও গোলমাল হল নাকি! এইসব ভাবছি আর তাকাচ্ছি ঘড়ির দিকে·····তেতাল্লিশ·····চুয়াল্লিশ····· পঁয়তাল্লিশ···

'বিপ্-বিপ্-বিপ্—'

একসঙ্গে কয়েকটা ঘটনা ঘটে গেল। টিভির পর্দায় একটা গ্রহের ছবি ফুটে উঠল—হলুদ আলোটা জ্বলছে··· আর 'মিস্টার ট্রানস্লেটর' 'বিপ্-বিপ্-বিপ্' শব্দটার অর্থ করে দিল: 'জু-২' এইমাত্র জুপিটারে ল্যাণ্ড করেছে।

আরো কি যেন দেখব···একদৃষ্টে তাকিয়ে আছি পর্দায়, আর মাঝে মাঝে আলোর দিকে দেখছি···ভাবছি রঙটার কি পরিবর্তন হবে না?

একটু পরেই দেখি, হলুদ আলোটা ক্রমশ নিষ্প্রভ হয়ে আসছে, আর সবুজ আলোটা ফুটে উঠছে; চোখের ভুল ভেবে, চোখ দুটো মুছে নিয়ে আবার তাকালাম। নাঃ, আলোর রঙ পরিবর্তন হচ্ছে। একটু পরেই সন্দেহের অবকাশ রইল না। দেখলাম, প্রায়-মানব কয়েকটা প্রাণী ঘুরে বেড়াচ্ছে···রয়েছে তাদের সাজান শহর···

চাপা উত্তেজনায় সময় কাটছে···'জু-২' থেকে পাঠান বার্তার অনুবাদ করছে মিস্টার ট্রানস্লেটর—। আমি নির্দেশ পাঠালাম, বন্ধুত্ব করার চেষ্টা করা হোক।

আরো কয়েক মিনিট কাটল। হঠাৎ সবুজ আলোটা কয়েকবার দপ্ দপ্ করেই নিভে গেল—আর জ্বলে উঠল নীল আলোটা। 'জু-২' খবর পাঠাল: সব ঠিকমত চলছে।

পর্দায় দেখতে পাচ্ছি ওখানকার একটা ল্যাবরেটরীর ছবি—বাব্বাঃ! এত বড়!! আরে! ওখানেও টিভি সেট! তার সামনে বসে কয়েকজন···কি যেন দেখছে··· একজন মানুষের ছবি না!

আর ঠিক সেই মুহূর্তেই কি যেন হয়ে গেল! বিশ্বাস করুন, ঐ শয়তানী বুদ্ধিটা না জাগলে···যাই হোক, যে কথা বলছিলাম, দুর্বুদ্ধি জাগতে 'জু-২'-কে নির্দেশ দিলাম

ল্যাবরেটরী দখল করতে—'জু-২'-এর মধ্যেই যুদ্ধের সাজ-সরঞ্জাম প্রস্তুত করা ছিল—যদি প্রয়োজন হয়, এই আশায়।

পর্দায় দেখি, প্রায়-মানবদের মধ্যে কেমন যেন ব্যস্ততা শুরু হয়ে গেল। কয়েকজন উঠে কটা সুইচ টিপে দিল… আর এদিকে আমার টিভির নীল আলোটা কয়েকবার রঙ বদল করেই নিভে গেল! কিছুক্ষণ কোন সাড়া-শব্দ নেই…সহসা লাল আলোটা জ্বলে উঠল…আর আমার ল্যাবরেটরী চোখ ধাঁধান আলোয় ভরে গেল……

ব্যস—আর কিছু মনে নেই—ঘটনাটা ঘটতে সময় লাগল মাত্র কয়েক সেকেণ্ড।

…তারপর যখন চোখ খুললাম, দেখি পূব আকাশটা ক্রমশ ফর্সা হচ্ছে।

মাথার মধ্যে কেমন ঝিম ঝিম করছে। কোনক্রমে উঠে টিভি-সেটের কাছে গেলাম—অন্ করা থাকলেও কোন ছবির দেখা নেই…মিস্টার ট্রানস্লেটর বোবা হয়ে আছে…ঘড়িটা রাত ১১টা ৫ সেকেণ্ড হয়ে থমকে দাঁড়িয়ে আছে…একটা আলোও জ্বলছে না…সব যেন কিসের ভয়ে তটস্থ…কি যেন প্রত্যক্ষ করেছে ওরা। *আমার গবেষণার কাগজ-পত্র সব নষ্ট হয়ে গেছে, ঐ* বিষয়ের খুঁটি-নাটি গোপন তথ্য আমার কিছু মনে নেই।

আমার নির্বুদ্ধিতার কথা ভাবতে ভাবতে হঠাৎ মনে পড়ে গেল টিভির ভেতরের প্রজেক্টারের কথা। তাড়াতাড়ি করে সেটা বার করলাম—হায়রে! সব ফিল্ম পুড়ে গেছে —শুধু একটুখানি জায়গা বাকী, ঐখানটাই পোড়েনি। ঐ জায়গায় লক্ষ্য করলাম একটা কালো দাগ। ম্যাগ্নিফাইং গ্লাস দিয়ে দেখলাম, কিছু লেখা রয়েছে। একটা কাগজে লেখাটার হুবহু যা নকল করলাম, তা হল কয়েকটা ইংরাজী অক্ষর পর পর সাজান ঃ

PFMg MnPScA PVSi AlHLiOFSiB. – NeScSFCaBA.

আমার এখন কাজ হল লেখাটার মর্মোদ্ধার করা। মিস্টার ট্রানস্লেটর তো অচল। কাজেই, কাজটা আমাকেই করতে হবে।

বহু চিন্তা-ভাবনার পর মাত্র কয়েক ঘণ্টা আগেই সেটার মর্মোদ্ধার করলাম। বিংশ শতাব্দীর একটা কেমিস্ট্রি বইতে দেওয়া ছিল মেণ্ডেলিকের 'শর্ট পিরীয়ডিক টেবল', যাকে বলা হয় মৌলের বা এলিমেণ্টের পর্যায় সারণী। একটু মাথা খাটিয়ে দেখলাম, অক্ষরগুলো কতকগুলো এলিমেণ্টের প্রতীক চিহ্ন। এবার আর এক ধাপ পেছোলাম। প্রতীক চিহ্ন অনুযায়ী এলিমেণ্টের প্রোটন সংখ্যাগুলো সাজালে হয় ঃ

15.9.12. 25.15.21.18. 15.23.14. 13.1.3.8,9.-14.5,—10.21,16.9.20.5.18.

এইবার ইংরাজী বর্ণমালায় দেখলাম, ঐ সংখ্যাগুলো কি হয়। তা সাজালে পাই নীচের ইংরাজী প্রবাদ প্রবচন ঃ

OIL YOUR OWN MACHINE.—JUPITER.

…যাই হোক, যাদেরকে প্রায়-মানব ভেবেছিলাম, তারা যে বিজ্ঞানে আমাদের চেয়ে অনেক অনেক বেশী উন্নত, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তাদের 'প্রায়-মানব' না *বলে 'অতি-মানব' বলাই ভালো।*

…কিন্তু, আমার এইসব কথা কেউ বিশ্বাস করবেন কি? সব প্রমাণই লুপ্ত। প্রজেক্টারকে প্রমাণ হিসাবে ব্যবহার করতে পারতাম—কিন্তু ফিল্ম তো পুড়ে গেছে। শুধু আমার মনের মণি-কোঠায় তা স্মৃতি হয়ে তোলা আছে।

…আর আমার লাভ-লোকসানের খতিয়ানটা আপনিই করবেন।

মোটামুটি সবকিছুই জানালাম। সাক্ষাতে আলোচনা করা যাবে। আর কি। ভালোবাসা নেবেন। শুভেচ্ছান্তে—

প্রফেসর আল্‌টিবাল্ নেক্‌সেক্‌সিস্

মেডেমেজ্‌সানূপ্ রিসার্চ সেন্টার, চন্দননগর

ভেবে বল'র উত্তর

১। ৯×৯৮৭৬+৪

২। উড়ুক্কু মাছ (FLYING FISH)

৩। জগদীশ চন্দ্র বসু

৪। রক্ত শূন্যতা (ANEMIA)

৫। গুটি যুক্ত শুঁটি জাতীয় উদ্ভিদের শিকড়

৬। কৃত্রিম জীন সম্পর্কে

৭। টেলিফোন যন্ত্র আবিষ্কার করে।

নিজে কর—স্পীকার

সুবীর কুমার বিশ্বাস

তোমরা অনেকেই হয়ত রেডিওতে অথবা রেকর্ড-প্লেয়ারে স্পীকার দেখেছ। আজ তোমাদের স্পীকার তৈরী করার এমন একটা সহজ পদ্ধতির কথা বলব যে তোমরা নিজেরা সহজেই এটা তৈরী করতে পারবে। সামান্য কটা জিনিস এটা তৈরী করতে দরকার হবে। (১) একটা দণ্ড চুম্বক (২) একটা আর্ট পেপার (৩) একটা প্লাস্টিকের কৌটা (৪) ৪ ফুট লম্বা অন্তরিত তামার সরু তার আর (৫) কিছু প্লাস্টিক তার, আঠা, কাঁচি ইত্যাদি।

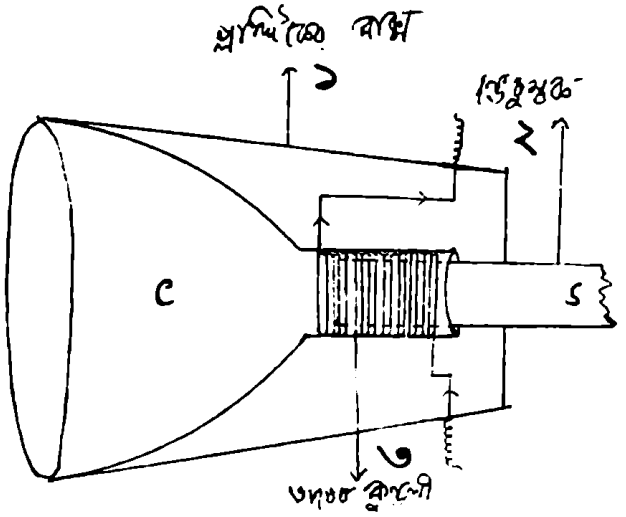

প্রথমে আর্ট পেপারটাকে কেটে আঠা দিয়ে জুড়ে একটা কাগজের চোঙ (C) তৈরী কর যাতে চোঙের পেছন দিকটা ছবির মতন একটু বাড়ানো থাকে। এবার ঐ বাড়ানো অংশে তামার সরু অন্তরিত তারটি দিয়ে প্রায় 35 অথবা 40টি পাক জড়িয়ে একটি সলিনয়েড বা কুণ্ডলী প্রস্তুত করতে হবে। এখন ঐ কুণ্ডলীর প্রান্তদুটি আলাদা করে রাখো। এবার কৌটার ভেতর চোঙটাকে ছবির মতন এমনভাবে আটকাও যেন চোঙের সামনের অংশ কৌটার সঙ্গে আটকানো থাকে কিন্তু পেছনের কুণ্ডলী-যুক্ত অংশ ঝুলন্ত অবস্থায় থাকে। এর ফলে ঐ সরু অংশে সামান্য কম্পন সৃষ্টি করলে চোঙে শব্দ উৎপন্ন হবে। এবার কৌটাটার পেছনটাকে মাপ মত কেটে দণ্ডচুম্বকটাকে এমনভাবে ঢুকিয়ে দাও যেন চুম্বকটার যে কোন একটি মেরু চোঙের তার জড়ানো অংশের ভেতর ঢুকে যায়। লক্ষ্য রাখতে হবে যেন চুম্বকটি চোঙ স্পর্শ না করে। চুম্বকটাকে চোঙের সাথে শক্ত করে এঁটে দিতে হবে। এবার সমস্ত জিনিসগুলি ভালভাবে দেখে নিলেই তোমার স্পীকার তৈরী শেষ। এবার ঐ তারের শেষ প্রান্ত দুটিকে কোন টেপ রেকর্ডার, রেকর্ড প্লেয়ার বা রেডিওর পিক্-আপে যুক্ত করলেই তোমার স্পীকারের কথা অথবা গান শুনতে পাবে। এখন চুম্বকটির শক্তি বৃদ্ধি করলে পরে স্পীকারের শব্দও জোরে হবে।

এখন এসো এর কার্য প্রণালীটা একটু তলিয়ে দেখা যাক। আসলে রেকর্ড-প্লেয়ার বা রেডিওর পিক্-আপে যখন তার দুটো যোগ করা হচ্ছে তখন বিভিন্ন মাত্রার তড়িৎপ্রবাহ ঐ তার দুটোর মাধ্যমে চোঙের উপরস্থ কুণ্ডলীর ভেতর দিয়ে যায়। এর ফলে ঐ তারের কুণ্ডলিটি বিভিন্ন মাত্রার চুম্বকত্ব প্রাপ্ত হয়। এই কারণে ঐ কুণ্ডলী এবং দণ্ডচুম্বকের মধ্যে আকর্ষণ অথবা বিকর্ষণ হয়। কিন্তু এই চুম্বকত্বের মাত্রা পরিবর্তনশীল বলে আকর্ষণ বা বিকর্ষণ বলও পরিবর্তনশীল হয়। এর ফলে ঐ কুণ্ডলীটি অর্থাৎ চোঙটি তড়িৎপ্রবাহকালে কম্পিত হয় এবং চোঙে শব্দ উৎপন্ন হয়।

দমদম মতিঝিল "কৃষ্ণকুমার হিন্দু একাডেমী" একাদশ শ্রেণীর ছাত্র, ১৬৮, ডঃ মেঘনাদ সাহা রোড, কলিকাতা-৭৪

বিজ্ঞান-জিজ্ঞাসা

শ্রীবৈজ্ঞানিক

১। অর্লন (orlon) কি জিনিস ?
২। 'রাডার'-এর আবিষ্কর্তার নাম কি ?
৩। মানব দেহে রক্ত সঞ্চালন তত্ত্ব আবিষ্কার করেন কে?
৪। T. N. T. কথার অর্থ কি ?
৫। সমুদ্রপথে দূরত্ব মাপা হয় কোন্ এককে ?
৬। স্টীম টারবাইন কে আবিষ্কার করেন ?
৭। 'মেসন' কণার আবিষ্কর্তা কে ?
৮। যক্ষ্মা রোগের টিকার নাম কি ?
৯। উদ্ভিদ বিজ্ঞানে 'মহুয়া' কোন্ শ্রেণীভুক্ত ?
১০। কোন্ স্তন্যপায়ী প্রাণী সরীসৃপের মত ডিম পাড়ে ?
১১। উড়োজাহাজে উচ্চতা মাপার জন্য কোন্ যন্ত্র ব্যবহৃত হয় ?
১২। 'লেড' ধাতুর আকরিক 'গ্যালেনা'র সংকেত কি ?
১৩। টাইটেনিয়াম ধাতুর আবিষ্কর্তা কে ?
১৪। কোন্ মৌলের পারমাণবিক গুরুত্ব 27 ?

(সমাধান পরবর্তী সংখ্যায় থাকবে)

ভারতীয় উদ্ভিদ উদ্যান

সহদেব ভট্টাচার্য

আমরা গত জানুয়ারী, ৮২ সংখ্যায় ভারতীয় উদ্ভিদ উদ্যান সম্পর্কে কিছু জেনেছি। এই সংখ্যাতে ভারতীয় উদ্ভিদ উদ্যান ও জনকল্যাণে-এর ভূমিকা সম্পর্কে কিছু আলোচনা করা হবে।

ডঃ রক্সবার্গ দেশবিদেশ থেকে বৃক্ষলতা গুল্মাদির নমুনা সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও নামকরণ করে এখানকার বিশ্ববিশ্রুত 'হারবেরিয়ামের' সূচনা করলেন। বর্তমানে এখানে প্রায় দশ লক্ষাধিক নমুনা বৃক্ষের সংগ্রহ ও সংরক্ষণ রয়েছে। এছাড়া ডঃ রক্সবার্গ প্রায় আড়াই হাজার বিভিন্ন বৃক্ষের রঙীন চিত্র অঙ্কন করান। সেই চিত্রগুলি আজও এখানে অক্ষুন্ন অবস্থায় রাখা আছে। এইগুলি 'রক্সবারো আইকনস' নামে পরিচিত। ঐগুলি কেবলমাত্র এই বাগানের সমগ্র উদ্ভিদ-বিজ্ঞানের এক অমূল্য সম্পদ। রক্সবার্গের সময়েই এ বাগানের অন্যতম আকর্ষণ মেহগনি গাছ ১৭৯৫ সালে পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ থেকে আমদানী করা হয়। আর ১৮৩০ সালের মধ্যেই এই মূল্যবান বৃক্ষ এখান থেকে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ে।

ইউরোপে যখন জাহাজের পাল ও মাস্তুলের জন্য শনের দড়ির অভাব ঘটল, বৃটিশ সরকার ভারতীয় এই উদ্যানের কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দিলেন যে দেশীয় ভেষজ থেকে শনের পরিবর্তে অন্য কোন তন্তু পাওয়া সম্ভব কিনা তা পরীক্ষা করে দেখতে। ১৭৯৩ সালে রক্সবার্গ সাহেব বাগানের দায়িত্ব গ্রহণ করবার পর এ সম্বন্ধে উচ্চতর গবেষণায় মনোনিবেশ করলেন। প্রকৃতপক্ষে তখন থেকে পাটশিল্পের ব্যাপক প্রসার লাভ ঘটল। ১৮২৮ সালে ভারতবর্ষ থেকে বৃটেনে যেখানে মাত্র ৬২০ টাকার পাট রপ্তানী হয়, সেখানে ১৮৮২-৮৩ সালে এই রপ্তানীর পরিমাণ দাঁড়াল ৬ কোটি টাকার মত। এখন এই টাকার অঙ্ক অনেক বর্ধিত হয়েছে।

সিঙ্কোনা গাছ কি এবং তা থেকে কি পাওয়া যায় তা আমরা অনেকেই জানি। সেই সিঙ্কোনা চাষের আবাদও সর্বপ্রথমে এই বাগানেই হয়েছিল এবং বহুদিন পর্যন্ত এই বাগানের অধ্যক্ষের অধীনে সিঙ্কোনার চাষ ও কুইনাইন সংগ্রহের ভার ছিল। ১৮৫৩ সালে প্রথমে সিঙ্কোনার চারাগাছ পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ থেকে এখানে আনা হয়। আবার ১৮৬২ সালে ১০০টি চারাগাছ আনা হয়। এর পরে দার্জিলিংএ ব্যাপকভাবে সিঙ্কোনার চাষ শুরু হয়।

দেশের বনজ সম্পদ বৃদ্ধির জন্য প্রতিবছর বনমহোৎসব উপলক্ষে সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠান, স্কুল, কলেজ ও জনসাধারণকে বিনামূল্যে নানাজাতের গাছের চারা বিতরণ করা হয় এ বাগান থেকে, এখানকার 'স্টুডেন্টস্ গার্ডেন' (Students Garden) ছাত্র-ছাত্রীদের বাস্তব শিক্ষার ক্ষেত্রে একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। গবেষক ও বৈজ্ঞানিকদের সুবিধার জন্য এখানে একটি মূল্যবান 'লাইব্রেরী' (Library) আছে, যেখানে প্রায় ৪০ হাজারের মত উদ্ভিদ, বন ও কৃষিবিষয়ক নানা প্রকারের দুষ্প্রাপ্য ও অতি পুরাতন এবং আধুনিক পুস্তকাদি দেশ-বিদেশ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। এই উদ্যান থেকে অগণিত পাণ্ডিত্য ও তথ্য-পূর্ণ উদ্ভিদ বিষয়ক গ্রন্থরাজি প্রকাশিত হয়েছে।

বর্তমানে 'হারবেরিয়ামের' নিকট গড়ে উঠেছে নতুন শীততাপ নিয়ন্ত্রিত বৃহৎ অট্টালিকা যেখানে সংকুলান হবে বর্তমান আর ভবিষ্যতের লক্ষ লক্ষ শুষ্ক নমুনা-বৃক্ষের সংগ্রহ ও সংরক্ষণ। এছাড়া আছে অন্যান্য উদ্ভিদ বিষয়ক গবেষণাগার এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য পুষ্প, ফল, বৃক্ষ অর্কিড, পরাগ প্রভৃতি উদ্ভিদ বিজ্ঞানের নতুন নতুন গবেষণা কেন্দ্র।

এখানে সোলারাম ভিয়েরাম বা সোলানাম খাসিয়ানাম (Solaram viyeram or Solanam Chasianam) নামক একটি বন্য উদ্ভিদের ওপর গবেষণা করে দেখা গেছে যে গাছের প্রচুর পরিমাণে সোলাসোডিন্ (Solasodin) নামক একপ্রকার শর্করা জাতীয় উপক্ষার (Alkoloid) পাওয়া যায়। এই উপক্ষার কার্টিজন (Alkoloid Cartigan) জাতীয় ঔষধ ও জন্মনিরোধক বটিকা তৈরী করতে লাগে। আশা করা যায় চিকিৎসা জগতে একদিন এই গাছ বিশেষভাবে সমাদৃত হবে।

এছাড়া গাছের উত্তেজক রস প্রয়োগ করে বিভিন্ন বনৌষধির উন্নতি ও বৃদ্ধি করে এদের মানবকল্যাণে ব্যবহারের উপযোগী করার চেষ্টা করা হচ্ছে।

ভারতবর্ষে চা উৎপাদনের কাহিনীও খুবই অদ্ভুত। চা শিল্প প্রসারেও এই উদ্যানের বিশেষ অবদান রয়েছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে এখানে চীন থেকে নিয়ে আশা চা-এর চারা রোপণ করা হয়। ১৮২৬ সালে কলকাতা ও লণ্ডনে জোর গুজব রটনা হল যে ভারতবর্ষের আসাম অঞ্চলে চা সবচেয়ে ভাল হয়। ১৮৩৬ সাল থেকেই প্রকৃত পক্ষে আসামে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চা উৎপাদন শুরু হয়। এরপর

ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে, যেমন দার্জিলিং, নীলগিরি, কুমায়ুন ও ভারতের অন্যান্য স্থানেও চা-এর চাষ ব্যাপকভাবে শুরু হয়।

কার্পাস, তুলো, তামাক, আলু, শন, কফি প্রভৃতির চাষ ও উন্নতির জন্যও এ বাগানের অবদান কম নয়। এরই মাধ্যমে দেশে বহু শিল্প গড়ে উঠেছে। এই শিল্প লক্ষ লক্ষ লোকের জীবিকা নির্বাহের সহায়ক হয়েছে। শিল্প দ্রব্য রপ্তানী করে অতি প্রয়োজনীয় বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে দেশকে সাহায্য করে চলেছে।

এছাড়াও কর্পূর, গোলমরিচ, এলাচ প্রভৃতি মশলার এমনকি জাহাজ নির্মাণের প্রয়োজনীয় শাল ও সেগুন কাঠের চাষ-আবাদও করা যাবে।

আঙ্গুর, লেবু যুঁই, কমল, রজনীগন্ধা, কচু, বাঁশ ও তাল জাতীয় বিভিন্ন গাছ এবং তাদের সমগোত্রীয় সবকটি প্রজাতিই সংরক্ষণ করার চেষ্টা করা হচ্ছে। এর দ্বারা নানা প্রকারের সহিষ্ণু ও উচ্চফলনশীল মূল্যবান বর্ণসঙ্কর গাছ উৎপন্ন করা যেতে পারে।

হয়ত অনেকেই জানেন না যে এ বাগান আজকের কৃষি, বন প্রভৃতি ফলিত উদ্ভিদ বিজ্ঞানের জননী।

দেশের জনকল্যাণে, জাতীয় ও বনজ জীবনে এ উদ্যানের অবদান যথেষ্ট। রক্সবার্গের সময় থেকে ভারত ও পার্শ্ববর্তী দেশসমূহের নিকট এ উদ্যান হয়ে আছে এক বিরাট গবেষণা কেন্দ্র। উচ্চতর উদ্ভিদ-বিজ্ঞানের গবেষণা কেন্দ্র হিসাবে দু'শতাব্দী যাবৎ এ উদ্যানটি এশিয়ার গর্ব। বছরের পর বছর এই ভারতীয় উদ্ভিদ উদ্যানের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব কেবলমাত্র বাগানের কর্মচারীদেরই নয়, এ দায়িত্ব আমার, আপনার এবং আমাদের সকলেরই।

দশম শ্রেণী, ঠাকুরাণীচক ইউনিয়ন হাই স্কুল
পোঃ—ঠাকুরাণীচক, হুগলী

(গতসংখ্যার বিজ্ঞান-জিজ্ঞাসার সমাধান)

১। মরফিন ২। EOSIN ৩। পিঁপড়া ৪। মলিবডেনাম ৫। থোরিয়াম ৬। আয়রন ৭। কিউরি ৮। সায়ানোজেন ৯। সেলেনিয়াম ১০। নাইক্রোম ১১। বৈদ্যুতিক মোটর ১২। হ্যাঁ, কোবাল্ট চৌম্বক পদার্থ ১৩। ডক্টর মেঘনাদ সাহা ১৪। নিওপ্রিন ১৫। জ্যোতির্বিদ অ্যাডাম্‌স (ADAMS)

ভেবে ভেবে বল

শুভব্রত রায়চৌধুরী

১। ৯×৯ +৭= ৮৮
৯×৯৮ +৬= ৮৮৮
৯×৯৮৭ +৫= ৮৮৮৮
?×???? +?= ৮৮৮৮৮

জিজ্ঞাসার চিহ্নগুলোতে কোন কোন সংখ্যা বসালে ৮৮৮৮৮ হবে?

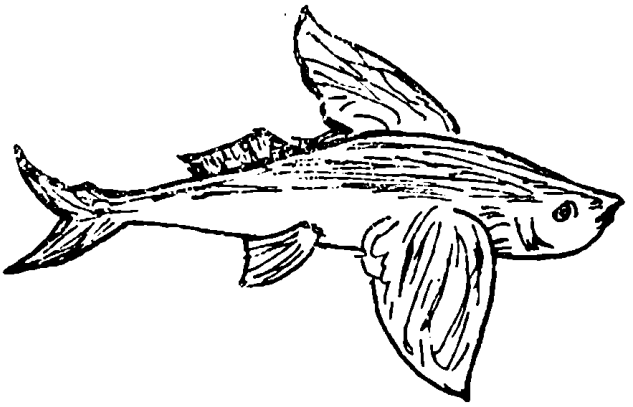

২। উপরের ছবিটি কোন্ মাছের বল?

৩। উদ্ভিদের স্নায়ুজাল প্রাণীদের মতো এটি কে ব্যাখ্যা করেন?

৪। সাধারণ মানুষের শরীরে যখন লোহিত কণিকা অথবা হিমোগ্লোবিনের মাত্রা কমে যায়, তখন সেই অবস্থাকে কি বলা হয়?

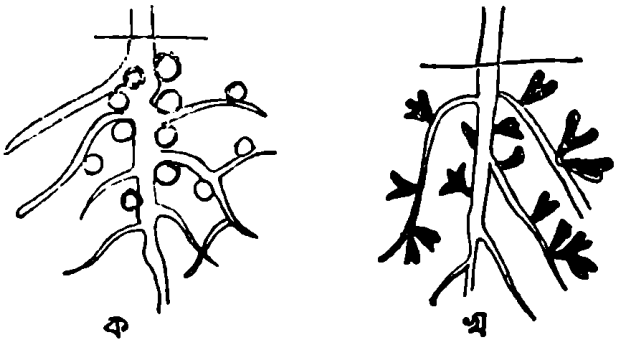

ক খ

৫। উপরের ছবিটি কিসের তৈরে বল।

৬। বৈজ্ঞানিক খোরানার নাম যুক্ত আছে (ক) রক্ত প্রবাহ সম্পর্কে; (খ) কৃত্রিম জিন সম্পর্কে; (গ) পচন নিবারক সারজারি সম্পর্কে।

৭। গ্রাহাম বেল কি জন্য বিখ্যাত হয়েছিলেন?

উত্তর ঃ ৫১ পাতায়

বুদ্ধি দিয়ে ব্যাখ্যা কর

বিদ্যুৎ মজুমদার

১) হঠাৎ একদিন শুনলাম গোঁসাই বাড়ি ঠাকুর উঠেছে আর সেই ঠাকুর নাকি শূন্যে ঝুলছে। গিয়ে দেখি হ্যাঁ, সত্যিই ঠাকুর শূন্যে ঝুলছে। সেখানে কোন বৈদ্যুতিক তার, সুতা বা অন্য কিছু দেখা যাচ্ছিল না। কেবল রঙ-চঙে ঠাকুরটি মাটি থেকে কিছু উপরে ঝুলছিল। কিভাবে এটা সম্ভব?

২) একদিন এক বন্ধুর বাড়ি গিয়ে দেখি সে একটি ফ্লাস্কে গরম জল ঢালছে এবং একটি থার্মোমিটার তাতে ডুবানো রয়েছে। হঠাৎ থার্মোমিটারের পানে তাকিয়েই দেখি থার্মোমিটার পাঠ দেখাচ্ছে ১৪০°। জল যেখানে ১০০°c বাষ্পে পরিণত হয় সেখানে ১৪০°-তেও জল আদৌ ফোটেনি। বাইরের থেকে চাপ প্রদান করার কোন ব্যবস্থাও সেখানে ছিল না। তবে কি আমি ভুল দেখলাম নাকি থার্মোমিটারই ভুল পাঠ দেখাল?

৩) কোন এক ম্যাজিসিয়াম একটি কাঠের বাক্স স্টেজের উপর আলতো ভাবে রাখলেন এবং দর্শকদের মধ্য থেকে একজন স্বাস্থ্যবান লোককে সেটা তুলতে বললেন। লোকটি শত চেষ্টা করেও সেই বাক্স তুলতে পারলেন না। তখন যাদুকরের একজন রোগা, জীর্ণ কর্মচারী অতি সহজেই সেই বাক্স তুলে ফেললো। কি করে এটা সম্ভব?

বুদ্ধি দিয়ে ব্যাখ্যা কর'র সমাধান

১) মূর্তিটি ছিল লোহার তৈরী। মূর্তিটির উপরে এবং নীচে দুইটি শক্তিশালী চুম্বক লুকানো ছিল। চুম্বকের আকর্ষণ বল দুইটির ঠিক মধ্যখানে মূর্তিটি রাখা হয়েছিল। ফলে সেটা ঝুলছিল।

২) স্কেলটি ছিল ফারেন হাইট স্কেল। ১৪০°ফা = ৬০°সে। ৬০° সে. তে জল ফোটে না।

৩) স্টেজের তলায় ছিল একটি তড়িৎ চুম্বক, (Electro magnet) এবং কাঠের বাক্সটির তলায় ছিল লোহার পাত। যখন দর্শকদের মধ্যে কেউ বাক্সটিকে তোলবার চেষ্টা করে তখনই তড়িৎ চুম্বকের মধ্যে দিয়ে তড়িৎ পাঠানো হয়। ফলে সেটি চুম্বকে পরিণত হয়ে বাক্সটিকে টেনে রাখে।

গ্রাম+পোঃ—অকালপোষ, বর্ধমান।

বিজ্ঞানের শব্দকূট

পারমিতা রায়

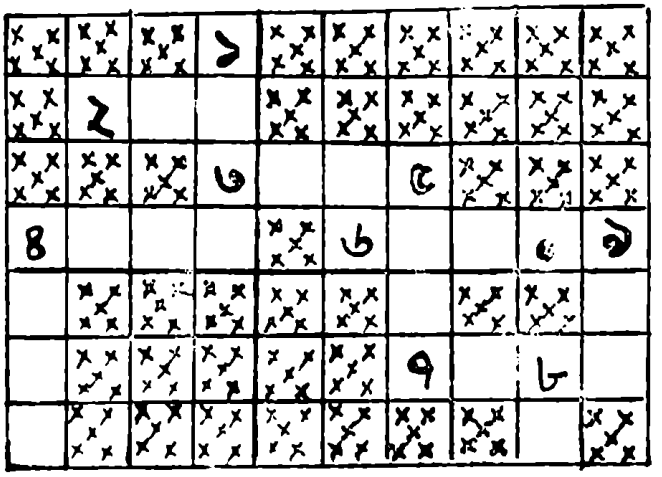

উপর নীচে :—

১। প্রাণী দেহ মধ্যস্থ কেন্দ্রীয় রক্ত সরবরাহক যন্ত্র।

৪। মেরুদণ্ডীর পাচনতন্ত্রে সহায়তাকারী অগ্ন্যনালীর পরবর্তী স্ফীত থলির মত অংশ।

৫। পদার্থের একক ভরের অবস্থান্তরের জন্য প্রয়োজনীয় তাপ।

৮। উদ্ভিদের রান্নাঘর।

৯। ম্যালেরিয়ার জীবাণু বাহক।

উত্তর : পাশাপাশি :

২। মেরুদণ্ডী প্রাণীর সর্ববৃহৎ পাচন গ্রন্থি।

৩। যে থলিতে পিত্ত জমা থাকে।

৪। পাচনের পর পাকস্থলীতে অবস্থিত খাদ্যাংশ।

৬। দ্রবণীয় জৈব অণুঘটক।

৭। খাদ্য হজম হবার প্রক্রিয়া।

হাবুলের বিজ্ঞান-ভাবনা

ধীরেন বল

নিয়মাবলী

গ্রাহকদের জন্য

- কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রতি ইংরাজী মাসের গোড়ায় প্রকাশিত হয়।
- প্রতি সংখ্যার মূল্য ২ টাকা। বারো মাসের বৈশাখ-চৈত্র গ্রাহক চাঁদা ২০ টাকা। শারদসংখ্যার মূল্য পৃথক।
- গ্রাহকদের ডাকমাশুল লাগবে না। under certificate of posting-এ গ্রাহকদের বই পাঠানো হবে। যারা রেজিস্ট্রী ডাকে নেবেন তাদের অতিরিক্ত ৩০ টাকা পাঠাতে হবে।
- M. O. বা Bank Draft KISHORE JNAN-BIJNAN-এর নামে পাঠাতে হবে।

এজেন্টদের জন্য

- ১০ কপির কমে এজেন্সী দেওয়া হয় না। কমিশন শতকরা ২৫ টাকা।
- ভি. পি. বা ব্যাঙ্ক মারফৎ পত্রিকা পাঠানো হবে। ডাক-মাশুল লাগবে না।
- এজেন্টদের অর্ডার অনুযায়ী সংখ্যা পিছু ১ টাকা করে অগ্রিম জমা রাখতে হবে।
- এলাকা ভিত্তিক এজেন্সীর জন্য সাক্ষাতে অথবা চিঠিতে যোগাযোগ করুন।

লেখকের প্রতি

- বিদ্যালয় পর্যায়ের ছাত্র-ছাত্রী এবং সর্বসাধারণের উপযোগী জনপ্রিয় বিজ্ঞানের রচনা কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞানে প্রকাশিত হবে। লেখার ভাষা ছোটদের উপযোগী এবং লেখার ভঙ্গি সহজবোধ্য হওয়া প্রয়োজন।
- ফুলস্ক্যাপ কাগজের একপিঠে বাঁদিকে মার্জিন রেখে স্পষ্ট হস্তাক্ষরে লেখা পাঠাতে হবে।
- আনুমানিক শব্দসংখ্যা ২৫০০।
- লেখার সঙ্গে উপযুক্ত ছবি (লাইনড্রয়িং/হাফটোন)-যুক্ত থাকা প্রয়োজন।
- রচনার শেষে লেখকের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি যুক্ত থাকা প্রয়োজন।
- প্রকাশিত রচনার বিষয়ে সর্বপ্রকার দায়িত্ব লেখকের, কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান কর্তৃপক্ষের নয়।
- অমনোনীত রচনা ফেরত দেওয়া সম্ভব নয়।
- যে কোন বিষয়ে আলোচনার জন্য সম্পাদকীয় দপ্তরে যোগাযোগ করতে হবে।

সম্পাদক : কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান

ছোটদের বই

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর
তেপান্তর ১৫·০০

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
ছোটদের কাশীনাথ ৬·০০

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
কিশোর অপু ১৫·০০
অপুর ছেলেবেলা ৬·০০
ছোটদের অপরাজিত ৬·০০

তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
ছোটদের কাজল ৬·০০

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়
ছোটদের সন্দীপন পাঠশালা

ঘনাদা ও টেনিদার গল্প

প্রেমেন্দ্র মিত্র
ঘনাদার জুড়ি নেই ৫·০০
মঙ্গলগ্রহে ঘনাদা ৫·০০
ঘনাদা বিচিত্রা ১৫·০০

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়
টেনিদার অভিযান ১৫·০০
চারমূর্তি ৫·০০
ঝাউবাংলোর রহস্য ৫·০০
কম্বল নিরুদ্দেশ ৫·০০

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়
হাতিচোর ৬·০০

সুজিতকুমার নাগ
কিশোর রচনাসমগ্র ১০·০০

দক্ষিণারঞ্জন বসু
কায়াহীনের কবলে ৪·০০
হট যাও হার্মাদ ৫·০০

শিশির ঘোষ
লাহুল সিংহের সন্ধানে ৬·০০

ধীরেন বল
হাস্যকর ৫·০০

দীনেন্দ্রকুমার রায়
যখের আসন ৬·০০

স্যার কোনান ডয়েল
কিশোর গোয়েন্দা গল্প ৭·৫০
কিশোর রহস্য গল্প ৭·০০

উপেন্দ্র কিশোর রায়চৌধুরী
গুপী গাইন বাঘা বাইন ৫·০০

ধীরেন্দ্রলাল ধর
দুরন্ত যাত্রী ৮·০০

শৈব্যা প্রকাশন বিভাগ
৮/১সি, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলি ৭৩

কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞানের পক্ষে রবীন বল কর্তৃক ৮/১এ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা ৭৩ হইতে প্রকাশিত এবং ৬ শিবু বিশ্বাস লেন, কলকাতা ৬, তাপসী প্রিন্টার্স হইতে মুদ্রিত। দাম দুই টাকা।

প্রচ্ছদমুদ্রন : রূপসা এন্টারপ্রাইজ, ২০০ বি বি গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলকাতা ১২